ভূতের বেগার

পরিচয় গুপ্ত

পরিচয় গুপ্ত

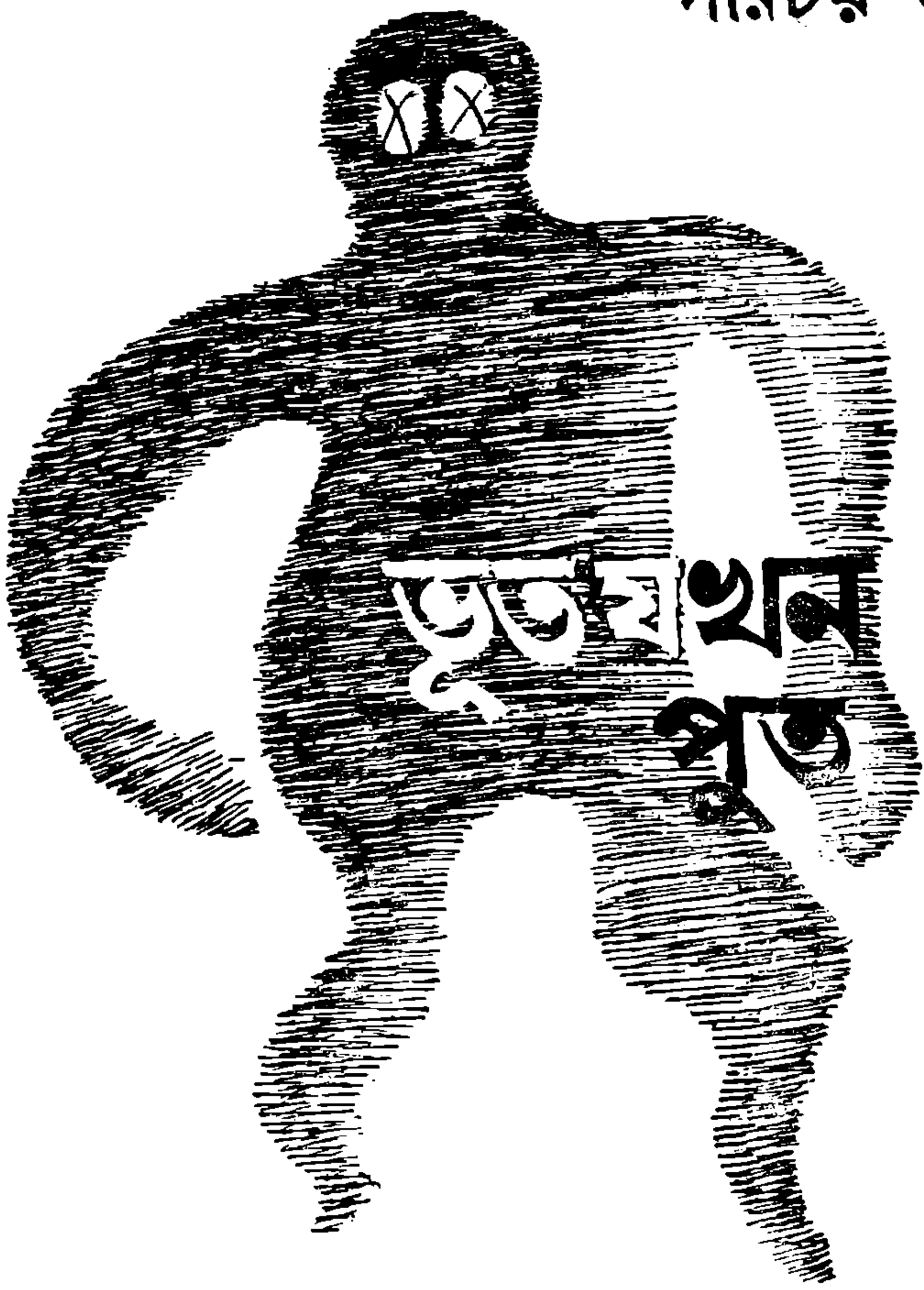

দে' জ পা ব লি শিং ॥ ক লি কা তা ৭ ০ ০ ০ ৭ ৩

প্রথম প্রকাশ:
—অক্টোবর ১৯৭৯
—আশ্বিন ১৩৮৬

দ্বিতীয় সংস্করণ :
—নভেম্বর ১৯৮৩
—অগ্রহায়ণ ১৩৯০

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
বিভূতি সেনগুপ্ত

ভেতরের ছবি : পরিচয় গুপ্ত

মুদ্রাকর :
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মান্না
পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : পাঁচ টাকা

কদিন ধরেই নিদারুণ শৈত্য প্রবাহ চলছিল সহরের ওপর দিয়ে।

ঠাণ্ডায় যখন লোকের দাঁত কপাটি লাগার যোগাড় ঠিক সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তেই একদিন জমিয়ে আড্ডা বসেছে আমাদের সুনির্দিষ্ট ক্লাব ঘরেতে।

প্রাত্যহিক কাজে কর্ম্মে সেদিন কারুরই বিশেষ মন নেই। অল্প বিস্তর কাজে ফাঁকি দেবার মনোবাসনা নিয়েই সকলে হাজির হয়েছে সেখানে।

আমাদের এই ক্লাবের আজীবন সভ্য বলে যারা পরিচিত যথা অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ অনেক আগেই এসে পৌঁছেছে। একমাত্র আসেননি এই আড্ডার চূড়ামণি, দর্জিপাড়ার দত্ত বাড়ীর বিশ্ব-বিশ্রুত বংশধর শ্রীশ্রীলম্বমান দত্ত ওরফে আমাদের পরম প্রিয় লম্বুদা।

আমরা যতদূর জানি লম্বুদা কাল পর্যন্ত ইণ্ডিয়াতে ছিলেন না। অন্ততঃ সেরকম খবরই ছিল আমাদের কাছে।

বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে-কে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দেওয়ার জন্যই নাকি তিনি উগাণ্ডায় গিয়েছেন। আজ ভোরের ফ্লাইটেই তাঁর ফেরার কথা।

যদি এসে পৌঁছান, আজকের এই মধুচক্রে তিনি যে হাজিরা দেবেনই সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই।

আমরা অন্ততঃ সেই বিশ্বাসটুকু তার ওপর রাখি।

আমাদের আড্ডা যেদিনই বসে, শুরুতেই সেদিনের চায়ের সঙ্গে টা-টা কি হবে সে নিয়ে কিছুক্ষণ হৈ-হট্টগোল চলে। সভ্যদের বেশীরভাগেরই পকেট গড়ের মাঠ হওয়ার দরুন তারা যতোটা গর্জায় ততোটা বর্ষায় না।

প্রতিবারই দশবিশ পয়সা মাথা পিছু চাঁদা তুলে এই ইচ্ছা পূরণ করতে হয়। অবশ্য লম্বুদা উপস্থিত থাকলেই একমাত্র এই রেওয়াজের ব্যতিক্রম ঘটে। খুশী মনেই তিনি পাঁচ-দশ টাকা পকেট থেকে বার করে টেবিলের ওপর রাখেন। মুচকি হেসে বলেন, খালি পেটে কি আর আড্ডা জমে!

সেদিন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন লম্বুদার আবির্ভাব ঘটল না অগত্যা সভ্যদের কাছেই যথারীতি এ ব্যাপারে আবেদন রাখা হল।

সঙ্গে সঙ্গেই 'খোঁজ' রব উঠল পকেটে। বেশ কিছু 'পাঁচ-দশ' পয়সা জমা হল টেবিলে।

ঠাণ্ডার বাজার বলেই হয়তো মেনু নিয়ে তেমন কোনও ঝামেলা হল না। সিঙ্গাড়া সহযোগে গরম চা-কেই ভোটে ফেলা হল এবং সর্বসম্মতিক্রমেই তা গৃহীত হল!

সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল আড্ডার অন্যতম সদস্য বাস্তবের ওপর। সে তৈরীই ছিল। টেবিল থেকে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে তখনি দৌড়াল স্থানীয় শর্মাজীর খাবারের দোকানে। গরম গরম ফুলকপির সিঙ্গাড়ার সন্ধানে। ফুলকপির সিঙ্গাড়ায় শর্মাজীর দোকানের প্রচণ্ড সুনাম।

যথাসময়েই বাস্তব ফিরে এল সিঙ্গাড়ার ঠোঙা হাতে নিয়ে।

সিঙ্গাড়ার ঠোঙাটা টেবিলের প্রশস্ত বক্ষ স্পর্শ করামাত্রই আড়াই ডজন চক্ষু নিবদ্ধ হল তার ওপর। কেউ কেউ আবার আবেগ সামলাতে না পেরে মুখে নানারকম শব্দও করে ফেলল। কেউ আবার চোখ বুজিয়ে ঘ্রাণ নিতে লাগল। প্রবাদে বলে, ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনম্!

সিঙ্গাড়া কিভাবে ভাগ বাটরা হবে এই চিন্তায় যখন অল্পবিস্তর সকলেই বিভোর, হঠাৎ ইন্দ্রজিৎ একটা কাণ্ড করে বসল।

সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে না পেরে ঠোঙার ফাঁক দিয়ে একটা সিঙ্গাড়া টেনে নিল এবং মুখে পুরে কামড় বসাল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে মুখরিত হ'য়ে উঠল ক্লাবরুম। সিঙ্গাড়ার উষ্ণতার গভীরতা সে ঠিক অনুমান করতে পারেনি বলেই এই দুর্ভোগ।

তার এই অসহায় অবস্থা দেখে অল্পবিস্তর সকলে বিব্রত বোধ করলেও তাকে সাহায্য করার মতো কিছুই ছিল না। কারণ সিঙ্গাড়াটি ইতিমধ্যেই তার দাঁতের ফাঁকে চেপে বসেছিল। কেউ কেউ এটাকে তার অধৈর্যতার উপযুক্ত শাস্তি ভেবেই মুচকি হাসতে লাগল।

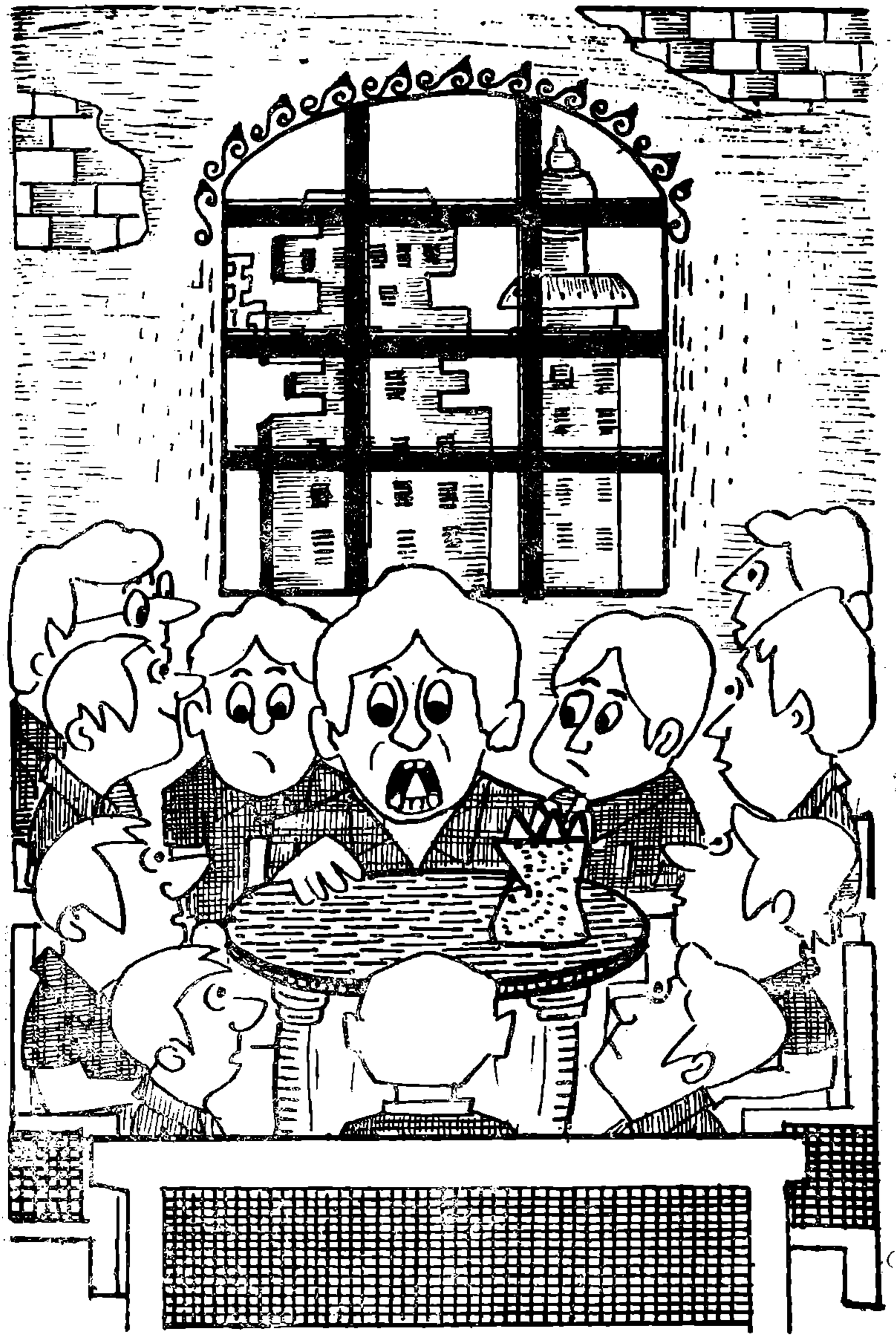

সিঙ্গাড়ার উষ্ণতার গভীরতা সে ঠিক অনুমান করতে পারেনি···

'উঃ' 'আঃ' 'ইস্' 'উস্' 'বাপরে-মারে' ইত্যাদি নানান অস্বস্তি সূচক ধ্বনির মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে সিঙ্গাড়াটিকে রপ্ত করতে, আমরা সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এবং নিজের নিজের ভাগে মনোনিবেশ করলাম।

সত্যিই শর্মাজীর সিঙ্গাড়ার তুলনা নেই। এর চরিত্রই আলাদা।

সংখ্যা সীমিত বলেই সকলে পাখীর মতো ঠুকরে ঠুকরে খেতে শুরু করে দিল।

নীরবতা ভঙ্গ করল প্রথম বিমল। রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছতে পুঁছতে বললে, আমি কি একটা প্রস্তাব করতে পারি? খেতেই খেতেই আমরা সকলে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো ঘাড় নাড়লাম।

বিমল পরম উৎসাহেই বলল, আজকের এই ঠাণ্ডার বাজারে আমাদের আড্ডার আলোচ্য বিষয়বস্তু পাল্টানো হোক। আমার মনে হয় আজ এই মুহূর্তে যদি আমরা ভূতের গল্পের আসর বসাই খুবই উপভোগ্য হবে।

এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত। এখন হাউস যা বলবে—

বিমল নীরব হবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে হৈ হৈ করে উঠল। কমল বললে, বিমলের সঙ্গে আমিও একমত। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ঠাণ্ডাও যেরকম বাড়ছে, একমাত্র ভূতের গল্পই আমাদের দেহ মনের উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে পারে। অতএব আর একমুহূর্ত বিলম্ব না করেই এখনই একখানা জমাটি ভূতের গল্প শুরু করা হোক।

ইন্দ্রজিৎ গম্ভীর হয়ে বললে, প্লীজ ওয়েট টিল টি কামস্!

সিঙ্গাড়া পর্ব শেষ হবার প্রায় দশমিনিট পরে কালী কেবিনের কেষ্টা ছোঁড়াটা এসে হাজির হল মাটির ভাঁড় আর কেটলি হাতে নিয়ে।

চায়ের ভাঁড়ে সশব্দে একটা চুমুক দিয়ে কমল বলল, প্রস্তাব তো সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হল, এখন বিড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে শুনি?

কমলের প্রশ্ন শুনে সকলেই সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তবে কয়েক মুহূর্তের জন্য।

সকলের কৌতূহল নিবৃত্ত করে অমল হাত তুলে বললে, অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমিই প্রথম শুরু করছি। কেমন—

অমল স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে আমরা সকলে নিশ্চিন্ত

মনেই চা পানে মনোনিবেশ করলাম।

চা-পর্ব পুরোপুরি মেটবার পূর্বেই অমল সরব হল। রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছতে পুঁছতে বলল, তা প্রায় আট দশ বছর আগেকার কথা। আমরা তখন মছলন্দপুরে থাকি।

এখন সেখানে প্রচুর ঘর বাড়ী হয়েছে। চেহারা প্রায় পুরোই পালটে গিয়েছে বললে চলে।

তখন কিন্তু এত ঘরবাড়ী তৈরী হয়নি। চারদিকে ছিল ফাঁকা মাঠ আর ধেনো জমি। বাসিন্দাও প্রায় আঙ্গুলে গোনা যেত। চাকরি বাকরি বিশেষ কেউই করত না। সকলেরই অল্পবিস্তর জমিজমা ছিল। সেখানে চাষবাস করেই সকলের সারাবছরের খোরাকি উঠে যেত।

দিল্লীতে আমার বড় মাসী থাকত।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বড় মাসীর বড় ছেলে রণ্টু বেড়াতে এল আমাদের গ্রামে। রণ্টু ছেলেবেলা থেকেই ভীষণ ডানপিটে প্রকৃতির। তাছাড়া দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার ফলে দেশের জিনিষ বা দেশীয় লোকেদের ওপর তার বিন্দুমাত্র টান ছিল না। সর্বদাই সে নাক সিঁটকে থাকত।

আমাদের গ্রামে এসেও সে তার সেই মনোভাব পালটাতে পারল না। বিভিন্ন ব্যাপারে সে প্রায়ই আমাকে 'গ্রাম্য' বা 'গেঁয়ো' বলে অপদস্ত করার চেষ্টা করতে লাগল যেটা আমার কাছে অস্বস্তিকর ঠেকলেও মুখে কিছু প্রকাশ করতে পারলাম না। নিতান্ত সৌজন্য বোধের খাতিরেই নীরবে সে অপমান সহ্য করতে লাগলাম।

একদিন দু'জনে মিলে গ্রামে একটা চক্কর মারতে বেরিয়েছি। রণ্টু বলল, সব রকম গাছই অল্প বিস্তর দেখলাম। কিন্তু ধান গাছ দেখা হল না। তোদের এখানে তো চারদিকেই ধানক্ষেত। চল না ধান গাছ দেখে আসি।

প্রস্তাবটা ও নিজে থেকেই করেছে যখন আমার কিছুই বলার নেই। আমি সাগ্রহেই তার ইচ্ছা পূরণে সাড়া দিলাম।

সমানেই ধানক্ষেত। ক্ষেতের মাঝ বরাবর আলের ওপর দিয়ে

চলেছি, হঠাৎ কাটা কিছু খড় পড়ে থাকতে দেখে সে বলল, চাষ করতে খড় লাগে বুঝি ?

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। প্রশ্নটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিনা যাচাইয়ের জন্য।

রণ্টু কিন্তু তার প্রশ্নে অটল রইল।

ধান গাছ থেকেই যে খড় হয় এটা আমি সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে দিতে, ও বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলল, আমার এতদিন আইডিয়া ছিল খড় গাছ আছে বুঝি! আমরা তো খড় দরকার হলে সুপার মার্কেট থেকে কিনি অতসত আর জানব কি করে বল। ক্ষেতের ওপর ঘুরতে ঘুরতে এমন অনেক অজানা জিনিষই তার জানা হয়ে যাচ্ছিল। সে তাতে খুশী হলেও মুখে প্রকাশ করছিল না। গেঁয়ো হয়ে যাওয়ার ভয়ে। হাঠৎ তেঁতুল পাড়ার মণ্ডলদের পরিত্যক্ত বাড়ীটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলে ওটা পোড়ো বাড়ী মনে হচ্ছে। লোকজন কেউ থাকে না নাকি ওখানে ?

আমি ঘাড় নাড়লাম। আগে থাকত মণ্ডলরা সপরিবারে। এখন থাকে ভূত!

তার মানে ? সকৌতূহলে রণ্টু তাকাল আমার মুখের দিকে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, হ্যাঁ ঠিক তাই। ওই বাড়ীর আশেপাশে যতো ক্ষেত দেখছিস সবই এককালে ছিল হারাণ মণ্ডলের।

হারাণ মণ্ডল খুবই প্রভাবশালী জমিদার ছিল। স্বচক্ষে তার জমিদারীর কাজকম্ম তদারক করার জন্য, তখনকার কালে বিশহাজার টাকা খচর করে এই বাড়ীটা তৈরী করেছিল এবং সপরিবারে এখানেই বাস করছিল।

সুখ সইল না তার। সইবেই বা কি করে, গরীব প্রজাদের যেভাবে উৎপীড়ন করত।

হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে হারাণ মণ্ডল হঠাৎ একদিন মারা গেল।

হারাণ মণ্ডলের দুই ছেলে তখন নাবালক। অগত্যা হারাণ মণ্ডলের স্ত্রী যশোদা দেবী নিজেই জমিদারী দেখাশুনা করতে শুরু করল। কিন্তু

তারও সে সুখ সইল না। দুই ছেলে হঠাৎ বসন্ত হয়ে মারা গেল।

পুত্র হারিয়ে যশোদা দেবীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। ক'দিন পরেই সে পাশের পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল।

মণ্ডল পরিবারের আর কোনও উত্তরাধিকারী রইল না।

বেশ কিছুদিন বাড়ীটা বেওয়ারিস পড়ে রইল।

খবর পৌঁছতে হারাণ মণ্ডলের এক মাসতুতো ভাই এসে একদিন বাড়ীর দখল নিল। কিন্তু সেও বেশীদিন ভোগ করতে পারল না।

সে থাকাকালীন নানারকম ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটতে লাগল বাড়ীতে।

ক'দিন সাহস করে রইল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও পালিয়ে বাঁচল। সেই থেকে আর কেউ ধার মাড়ায়নি ওই বাড়ীর। তা প্রায় দশবছর হয়ে গেল।

এখন ওটা প্রায় পুরোপুরিই ভূতের আড়ৎ, বলে আমি রণ্টুর মুখের দিকে তাকালাম।

রণ্টু ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল যেন সে খুব ভয় পেয়েছে।

আমি মনে মনে খুব খুশী হলাম। রণ্টুর মতো ডানপিটে ছেলেকে ঘাবড়ে দেওয়া কম কথা নয়। আমি আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছি দেখে হঠাৎ ও হো-হো করে হাসতে হাসতে বসে পড়ল মাটিতে।

যতোই ওকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করি, ততোই ওর হাসির বেগ বেড়ে যেতে লাগল।

বেশ একটু অপ্রস্তুতই হলাম। এত হাসির কিইবা কারণ থাকতে পারে বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। আগাগোড়া তার সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছিল স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তেমন কিছু বেফাঁস বলেছি বলে তো মনে পড়ল না।

এবার আমারই বোকা বনার পালা। আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ।

রণ্টু আর হাসতে পাচ্ছিল না। দমের অভাবে সে গোঁ গোঁ করে মুখে শব্দ করতে লাগল।

ধৈর্য ধরে আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা ভিন্ন আর কোনও পথ রইল না।

আমার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, গ্রামের লোকেরাই তো গেঁয়ো ভূত। এখানে আবার ভূতেরা আসবে কী করতে। তাদের কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই?

রণ্টুর কথা শুনে রাগে আমার গা রী রী করে উঠল। বেশ ঝাঁঝালো স্বরেই বলালম—একথা তোকে উইথড্র করতে হবে।

তোরা দিল্লীতে থেকে এমন কী রাজ কাজ করিস যা আমরা পারিনা?

রণ্টু বললে, তোরাতো গেঁয়োই। গেঁয়োই যদি না হবি তাহলে কি আর ভূত বিশ্বাস করিস! ভূত তো গেঁয়োদের জন্যেই তৈরী। দেখিস না একমাত্র গ্রামেই রাজ্যের ভূতেদের বাস।

হুঁঃ, চল আমাদের দিল্লীতে—একটা যদি ভূত বা ভূতুড়ে বাড়ী দেখাতে পারিস আমি সারাজীবন তোর গোলাম হয়ে থাকব।

রণ্টু বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই কথাগুলো বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এবং মুখে শিস দিতে লাগল।

আমি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বললাম, ভূত কি আমিই বিশ্বাস করি নাকি? আমিই তো কোনও দিন ভূত দেখিনি। তবে আমার বাবা কাকা ভূত স্বচক্ষে দেখেছেন বলেই আমি বলি। না দেখলে হয়তো তোর মতোই বিশ্বাস করতাম না।

রণ্টু যেন এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। ঠোঁট উল্টে বললে, যদি নাইই বিশ্বাস করিস তাহলে তোর ভূতের ভয় নেই নিশ্চয়ই।

আর সেটাই যদি সত্যি হয়, আজকের রাতটা তুই মণ্ডলদের বাড়ীতে একা কাটা দিকিনি। দেখি তোর বুকের পাটা কতখানি!

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, যদি কাটাতে পারি কি দিবি?

রণ্টু এক মিনিট ভাবল। পকেট থেকে তার জুনিয়ার পার্কার পেনটা তুলে, আমার চোখের সামনে নাচিয়ে বললে, এটা পাবি।

বিলিতি মাল। বুঝতেই পারছিস এর দাম কত। এখন মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না।

ক'দিন হল পূর্ণিমা গিয়েছে।

চাঁদ উঠতে দেরী হবে। চারদিক জমাট অন্ধকারই বলা চলে।

আমার এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বাড়ীতে কিছুই ভাঙলাম না। বাড়ীতে জানাজানি হলে যে সকলেই বাগড়া দেবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত মিথ্যার আশ্রয়ই নিতে হল আমাকে।

মামার বাড়ীতে বেড়াতে যাবার নাম করেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একমাত্র রণ্টু ছাড়া আর কেউই জানল না সে খবর।

রণ্টু অবশ্য আমায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। পথে সে আমার সঙ্গী হল। আমি সত্যি সত্যিই মণ্ডলদের বাড়ী পর্যন্ত যাই কিনা সেটা দেখাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

দুজনে এক সাথেই চলেছি। মুখে কারুরই কথা নেই। রণ্টু মাঝে মাঝে শিস দিয়ে কী যেন একটা হিন্দী গানের সুর ভাঁজছে।

আমরা যখন ওই বাড়ীর প্রায় একশো গজের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছি, রণ্টু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে বললে, আর এগিয়ে লাভ নেই বন্ধু। বাড়ী ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

তুই যা। আমি এখানেই দাঁড়াই।

রণ্টুর চাতুরি আমি বুঝে ফেললাম। কিন্তু কিছুই বলার নেই। বাজীটা আমার যাওয়া নিয়ে। আমাকেই যেতে হবে।

যতদূর দৃষ্টি যায় আমি বারবার তাকালাম পিছন দিকে। আমি এগুনোর সঙ্গে সঙ্গেই, রণ্টুও বাড়ীর পথ ধরেছে। তবে সে আর পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না।

এই মাঠে ঘাটে আমাদের শৈশব কেটেছে। পথঘাট অল্পবিস্তর সবই আমার পরিচিত। এমন কি কোথায় ক'টা গাছ আছে তা পর্যন্ত আমি মুখস্থ বলতে পারি।

যেতে আমার কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না তবে শুরুতে আমার যে গতি ছিল বাড়ীর কাছাকাছি এসে ক্রমশঃই তা মন্থর হয়ে আসতে লাগল।

বাড়ীর সুমুখে হাজির হতেই আমার দেহের শিরায় উপশিরায় এক বৈদ্যুতিক শিহরণ খেলে গেল।

কয়েক মিনিটের জন্য থমেরে দাঁড়িয়ে রইলাম বাড়ীর সামনে। খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম এতদিনের দুঃস্বপ্নময় সেই অভিশপ্ত বাড়ীটা।

সদর দরজাটা ভেজান থাকলেও প্রায় ঝুলছিল ফ্রেম থেকে। এগিয়ে গিয়ে দুহাতে ধরে ঠেলা দিতেই, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে একটা বিশ্রী শব্দ করে উঠল। কপাট জোড়া ঈষৎ ফাঁক ক'রে মুখ বাড়াতেই, একটা মাকড়সার জাল জড়িয়ে গেল আমার সারা মুখেতে। গায়ের মধ্যে শির শির করে উঠল। হাত দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করে বাড়ীর ভেতরে সভয়ে পা বাড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গেই 'ধুপ' করে একটা শব্দ হল ভেতরে। বুকের মধ্যে ঢিপ করে উঠল এবং সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল।

এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে এবং এটা নিছকই একটা অভৌতিক কাণ্ড ভেবে মনকে ভরসা দিতে লাগলাম।

আর কোনও সাড়াশব্দ না পেতে এবার এগুলাম বাড়ীর ভেতর। বাঁ দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে স্তূপাকার মাটি আর ভাঙা ইঁট। সিঁড়ির হাতল সংলগ্ন লোহার শিকগুলো অধিকাংশই চুরি হয়ে গিয়েছে, ফলে কোথাও কোথাও রেলিংটা হেলে পড়েছে।

এই হাতল ধরে ওপরে ওঠা রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার। যে কোনও মুহূর্তেই বিপদ ঘটতে পারে।

বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে ওই জঞ্জাল ডিঙ্গিয়েই সোজাসুজি ওপরে উঠে যাব মনস্থ করে পা বাড়ালাম।

আট দশটি সিঁড়ি ভাঙ্গার পরই লক্ষ্য করলাম শিলিং থেকে খসে পড়া একটা বড় বালির চাবড়া সিঁড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাকালাম ওপর দিকে। যদি বিপজ্জনক কিছু থাকে। এই ধরণের বালির চাবড়া যদি মাথার ওপর একটা পড়ে মাথার চাঁদিটা ছেঁদা হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়।

ভূত দেখতে এসে শেষকালে মাথা ফাটিয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়া এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর কিছু নেই। তাছাড়া এ-কাণ্ডটা যে

ভূতের দ্বারা হয়নি সেকথা সকলকে বোঝানোও রীতিমত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ভূত আর যাই হোক বালি তো হতে পারে না।

দুর্গানাম জপ করতে করতেই ওপরে উঠতে লাগলাম।

দোতলায় পৌঁছতে প্রায় চল্লিশটা সিঁড়ি ভাঙ্গতে হল। হারাণ মণ্ডল নিজে বসবাস করবে বলেই হয়তো তলার উচ্চতা এতো বেশী করেছিল।

সিঁড়ির মুখেই লম্বা ধরণের বারান্দা। বারান্দার কোলে পর পর তিনখানা ঘর। শেষ প্রান্তে রেলিঙ। রেলিঙের ধারে দাঁড়ালে সুমুখে তার জমিদারীর সীমানা দেখা যায়।

মাঠে যখন ধানের বীজ রোপন করা হতো বা ধান পাকলে কাটা শুরু হতো, তখন হারাণ মণ্ডল এখানে বসে থেকে কাজকর্ম তদারক করত।

তার বসার আরাম-চেয়ারটা যথারীতিই পড়ে আছে একপাশে। সেটা যে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত, সেটা তার জীর্ণদশা দেখলেই মোটামুটি অনুমান করা যায়। গদীটা ছিঁড়েও তুলো বেরিয়ে পড়েছে।

রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হল যেন একটা ছাইরঙের আলোয়ান চাপা দিয়ে সারা গ্রামখানা ঝিমুচ্ছে।

আমাদের বাড়ীটা দেখবার চেষ্টা করলাম। সারিবদ্ধ নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে চিলেকোঠার টালীর ছাদটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চিলেকোঠার সংলগ্ন ছোট ছাদের পাঁচিলের ধারে মনে হচ্ছে যেন একটা মাথা নড়ছে। রণ্টুও হতে পারে আবার চোখের ভুলও হতে পারে।

অন্ধকারে এ ধরণের বিভ্রম কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

মাঝে মাঝে লেড়ীকুত্তার ডাকে গ্রামের সাময়িক নীরবতাটুকু ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

দু'একটা শিয়াল এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। যতখানি ভয় পেয়েছিলাম কিছুক্ষণ এখানে কাটানোর ফলে, কিছুটা মন হালকা হল। মনে হতে লাগলো হয়তো বা রণ্টুর এই চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাবই দিতে পারব।

এবার ভূত প্রসঙ্গে নানাকথাই মনে আসতে লাগল। যদি নেহাৎই ভূতের পাল্লায় পড়ি, কীভাবে আত্মরক্ষা করব তার একটা প্রস্তুতি করতে

লাগলাম মনে মনে। সেটা শারীরিক বা মানসিক দুইই হতে পারে।

একবার মনে হল এই ভূতুড়ে বাড়ীতে নেহাৎই যদি বন্দী হয়ে পড়ি তাহলে সরাসরি ঝাঁপ মারব পথে এই বারান্দা থেকে। আর বেরিয়ে পড়ার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই। অবশ্য লম্বা পা ফেলে কেউ পেছু ধাওয়া না করলে।

আবার মনে হল সঙ্গে কিছু অস্ত্রসস্ত্র রাখলেও ভালো হতো। সরাসরি আক্রমণ করলেও আর কিছু না পারি তাকে ঘায়েল তো করা যেত। তাই বা কম কি।

আমার এই অলস চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রাতের গভীরতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষিপ্ত চীৎকার চেঁচামেচি যেটুকু ভেসে আসছিল তাও ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয়ও কিছু কিছু কমছে এবং মোটামুটি একটা বোঝাপড়া গড়ে উঠছে এই নির্জন পরিবেশের সঙ্গে।

বিকেল থেকেই মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছিল।

বাতাসের চাপে নুইয়ে পড়া গাছগুলো থেকেও এক বিচিত্র ধরণের শব্দ ভেসে আসছিল।

এখানে দাঁড়িয়ে এ ধরণের ঝোড়ো হাওয়া খাওয়া ঠিক সমীচীন বলে মনে হল না। এত খোলা হাওয়া—ঠাণ্ডা লেগে হিতে বিপরীত কিছু একটা ঘটলে কে দেখবে? এখনই কোথাও আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন।

সুমুখে সারিবদ্ধ ঘরগুলোর দুটিতে দরজা ভাঙা। সম্ভবতঃ দীর্ঘদিনের দেখাশুনার অভাবে সেগুলো আলগা হয়ে গিয়ে এই পরিণতি। ভবিষ্যতে হয়তো কেউ সেগুলো খুলে নিয়ে যাবে। আশ্রয় নিলে একমাত্র মধ্যিখানের ঘরটিতেই নেওয়া যেতে পারে।

চারদিকে সর্তক দৃষ্টি রেখেই এগিয়ে গেলাম ঘরের দিকে।

কপাট জোড়ার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়াতেই চোখে পড়ল দুটো ভাঙা চেয়ার। তবে চেয়ারগুলো ব্যবহারযোগ্য কিনা বোঝা গেল না।

ঘরের ভেতর পা দিতেই ঘরের কোণে জমাট বাঁধা একখণ্ড অন্ধকারে

'ঝটপট' করে কী একটা শব্দ হল।

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল। পিছিয়ে এলাম তিন পা।

আবার সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

ঘর থেকে বেরিয়ে না এসে চৌকাঠ বরাবর দাঁড়িয়ে রইলাম। তেমন কিছু ঘটলে যাতে সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে পারি।

বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম! আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। ধীরে ধীরে সাহস ফিরে আসতে লাগল।

ঘরের কোণে পক্ষী জাতীয় কোনকিছুতে বাসা বেঁধেছে।

ভালো করে বোঝা না গেলেও, চামচিকেই মনে হল। এই পরিবেশে চামচিকেতে বাসা করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। এমন নোংরা ও অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে এখানে রাত কাটানো কষ্টসাধ্য মনে হল। পাশের ঘরে কপাট না থাকলেও অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার।

তাছাড়া মাঝখানে একটা তক্তপোশও রয়েছে। প্রয়োজনে ওর ওপরে বসেও কিছুক্ষণ সময় কাটানো যাবে।

ঢুকলাম ঘরেতে। তক্তপোশটা ধূলোয় ভর্তি। পা দিয়ে ধূলোটা ঝেড়ে নিলাম। আমার পাদস্পর্শে নড়বড়ে তক্তপোশটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ করে উঠল।

এক নাগাড়ে ঘণ্টা দুই দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পা দুটো অবশ হয়ে পড়েছিল। তক্তপোশের ওপর বসে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

এদিকে বাইরে জমাট বাঁধা অন্ধকার ক্রমশঃই পাতলা হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদের আলোর বন্যা বইবে।

কিছুক্ষণ সেখানে অলসভাবে বসে থাকার ফলে স্বাভাবিক কারণেই চোখ দুটো ঘুমে জুড়ে এল।

নেহাৎই আমরা অভ্যেসের দাস। বারোটা বাজলে আমি আর জেগে থাকতে পারি না। অন্তত বিশ পঁচিশ মিনিট ঘুমিয়ে নেওয়া চাইই।

ঘুম ঠেকাতে একটা গানও ধরলাম। গান গাইলে নাকি ভূতের ভয় এবং চোখের ঘুম দুইই চলে যায়।

কিন্তু অসময়ের গান বলেই হয়তো আমার আসল উদ্দেশ্য সফল

হল না অর্থাৎ ঘুম আবার দু'চোখ ভরেই নেমে এল।

ঘুমের সাথে এবার শক্তি পরীক্ষা শুরু হল। আমি ঘুমাব না কিন্তু ঘুম নাছোড়বান্দা।

হঠাৎ ঠক্-ঠক্-ঠক্ তিনবার শব্দ হল দরজায়।

ঘরে উপস্থিত সকলেই সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। সকলেরই চোখ চলে গেল সেদিকে।

ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে গিয়ে হুড়কো টানতেই যিনি সহাস্য বদনে ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি আর কেউই নয় আমাদের চির প্রত্যাশিত লম্বুদা।

লম্বুদার পোষাকের কিঞ্চিৎ হেরফের ঘটেছে।

সাধারণতঃ তিনি খাকি হাফপ্যান্ট ও সাদা হাফশার্ট পরেই আসেন। গলায় একটা রঙ চটা নীল মাফলার জড়ান থাকে।

আজ কিন্তু জামা ও প্যান্ট দুটোই পাল্টেছেন। গাঢ় নীল বর্ণের ট্রাউজারের সঙ্গে কমলা রঙের একটি চামড়ার জ্যাকেট গায়ে চড়িয়েছেন।

মাফলারটির অস্তিত্ব খুঁজে বার করা খুবই মুশকিল! কারণ সবুজ বর্ণের বাঁদুরে টুপিটা চোখের কালো মণি দুটো ছাড়া আর সব কিছুই ঢেকে ফেলেছে!

বিমল ফিসফিস করে আমাকে প্রশ্ন করলে, কীরে লম্বুদা তো? নাকি অন্য কেউ? মুখটা যেরকম ঢেকে রেখেছে চেনার তো কোন উপায় নেই।

আমি বললাম, এক মিনিট। দুটো কথা বলতে দে তাহলেই আমরা বুঝে ফেলব। চেহারা নকল করা যায় কিন্তু অমন বুলি কপচাবে কে?

যা হোক তিনি ঘরে ঢুকে তার অভ্যেস মতোই নির্দিষ্ট চেয়ারটি দখল করলেন। মাথার বাঁদুরে টুপিটা টেনে হিঁচড়ে খুলতে খুলতে বললেন, একজন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানের জিনিস মাথায় পরে থাকার মধ্যে গৌরব আছে, কী বল? অবশ্য ...

লম্বুদার ইঙ্গিতটা বুঝতে আমাদের কারুরই অসুবিধা হল না। কমল

একটু রসিকতা করে বললে, ক্যাসিয়াস ক্লে-কে বলে এনেছেন তো ?

লম্বুদা চোখের পাতা দুটো উলটে কমলের দিকে তাকালেন। এক মিনিট নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, দু'হাত ধরে স্বামী-স্ত্রীর সাধাসাধি, কিনা আমার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হতে পারে।

যতো বোঝাই আমার পঞ্চাশ বছরের জীবনে মাত্র একদিন এক ঘণ্টার জন্য টেমপারেচার সাতানব্বই ক্রশ করে আটানব্বই ছুঁয়েছিল, ওরা নাছোড়বন্দা। বিশেষ করে ক্যাসিয়াসের বৌ। এটা মাথায় পরতে তবে পাইলটকে এয়ারপোর্ট থেকে বিমান ছাড়তে দিল। উঃ—লম্বুদা একমিনিটের জন্য গম্ভীর হয়ে গেলেন। পকেট থেকে চুরুটের কেসটা বার করে, ডালাটা খুলতেই গোটা কয়েক আধপোড়া চুরুট উঁকি মারল।

কোনটি খাবেন চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একটা জোরাল ঘ্রাণ টেনে বললেন, বাতাসে ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছি কী ব্যাপার ?

লম্বুদার প্রশ্নটা শুনে যখন আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি, হঠাৎ বিপ্লব 'মাই গড' বলে চীৎকার করে উঠল এবং পকেট থেকে সিঙ্গাড়ার ঠোঙাটা বার করে লম্বুদার হাতে দিয়ে বলল, রাইট ইউ আর। আপনি আসবেন জেনেই আপনার ভাগটা আমরা সরিয়ে রাখতে ভুলিনি। গরমই আছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।

লম্বুদা মিনি গোয়েন্দাগিরিতে সফল হতে তাঁর চোখে একটা খুশীর ঝিলিক খেলে গেল।

সিঙ্গাড়ার ঠোঙাটা ঈষৎ ফাঁক করে দুই আঙ্গুলের সাহায্যে একটা শূন্যে তুলে মুখের সামনে নাচাতে নাচাতে বললেন, হুঁ নির্ঘাৎ ধা—পা—

আবার বিস্ময়ের পালা নাবল সকলের চোখে।

ধাপার সঙ্গে সিঙ্গাড়ার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে, আমাদের কারুরই মাথায় এল না। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি দেখে লম্বুদা ফিক করে এক ঝলক হাসলেন।

ঠোঁটটা ছুঁচলো করে বললেন, সিঙ্গাড়ার কপি বলছে তার জন্ম ধাপাতেই। অর্থাৎ ধাপার কপি দিয়েই এই সিঙ্গাড়া ভাজা হয়েছে!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। সিঙ্গাড়ার মধ্যে যে কপির পুর ছিল সেটা

আমাদের কারুরই এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। না থাকারই কথা কারণ অনেকক্ষণই তা হজম হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়াও সিঙ্গাড়ার খোলসের ওপর থেকে, ভেতরে পুরের গন্ধ শুঁকে তার জন্মস্থান বলা কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য ঘটনাই বটে।

এক্ষেত্রে আমাদের মন্তব্য করার মতো কিছুই ছিল না। কেউ বা সশব্দে কেউ বা নিঃশব্দে একটা ঢোক গিলল মাত্র।

লম্বুদা অবশ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন নি। ইতিমধ্যেই তিনি সিঙ্গাড়ার বক্ষস্থলে একটা কামড় বসিয়েছেন। একজোড়া সিঙ্গাড়া লম্বুদার কাছে কিছুই নয়। নেহাৎই দু টিপ নস্যি বলা যেতে পারে।

মুড়ি মুড়কির মতোই সিঙ্গাড়া দুটো তাড়াতাড়ি উদরস্ত করে, একটা ঢাউস ঢেকুর তুললেন।

ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, সিঙ্গাড়াই যখন খাওয়ালে, চা আর এক রাউণ্ড হোক। যা ঠাণ্ডা পড়েছে!

ইন্দ্রজিৎ 'এগ্রিড' বলে হাত তুলল।

লম্বুদা কোনওরকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই পকেট থেকে একটা দু টাকার নোট বার করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, দু টাকা সিরিজের পয়লা নম্বর নোট এটা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এটা আমায় উপহার দিয়েছিলেন। এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আ-ছে!

যথাসময়েই কেটলিতে চা এল।

লম্বুদা একাই তিন ভাঁড় চা খেয়ে ফেললেন। চুরুট কেস থেকে আধপোড়া একটা চুরুট বার করে ধরালেন এবং চোখ বুজে মুখ থেকে ধূম উদ্গীরণ করতে লাগলেন।

বেশ কিছু ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠাণ্ডার বাজারে ট্রপিকস্‌টা কিন্তু ভালই বেছেছ। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছি। ওতেই আমার শরীর গরম হয়ে গিয়েছে।

যা হোক, আয় সময় নষ্ট কর না। শুরু কর—

আমি শুরু করব বলে প্রস্তুত হচ্ছি লম্বুদা হঠাৎ আমার মুখের সামনে তর্জনীটা তুলে বললেন, ওয়েট এ বিট।

ভূতের গল্প শোনার জন্য যখন সকলেই আমরা উৎগ্রীব, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদার এই অনুরোধে সকলেই অল্পবিস্তর সজাগ হয়ে উঠল এবং ফ্যানটাসটিক একটা কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

লম্বুদা অবশ্য সময় নষ্ট করলেন না। চুরুটটা পর পর কয়েকবার টেনে নিলেন এবং ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক করে শূন্যে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার কাণ্ড কারখানা দেখে আমাদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি শুরু হয়ে গেল।

লম্বুদা আড়চোখে সেটা প্রত্যক্ষ করলেও তার মধ্যে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বরং আরও নির্বিকার চিত্তেই তাঁর কৃতিত্ব প্রদর্শনে মন দিলেন।

তিনি থেকে থেকে ধোঁওয়া ছাড়তে লাগলেন এবং তা থেকে কী যেন একটা বস্তুর আকৃতিগত রূপ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রতিকৃতিটা কার আমরা অনুমান করতে না পারলেও, তিনি যে এটা অনর্থক আঁকেন নি এবং পিছনে কোনও উদ্দেশ্য রয়ে গিয়েছে সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কারই ছিল।

কাজটা সম্পূর্ণ হতে তিনি প্রশ্ন করলেন, আনডারষ্ট্যাণ্ড মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডস্ ?

আমরা সমস্বরে 'না' বলতে তাঁর চোখ দুটো চকচক করে উঠল। মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, না বোঝাই স্বাভাবিক। তবে তৈরী থাক এখনিই একে দেখতে পাবে।

এদিকে প্রতিকৃতিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই, মূল রহস্যটা ব্যক্ত করার জন্য লম্বুদাকে অনুরোধ জানালাম।

লম্বুদা হয়তোবা এটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

আমরা বলামাত্রই তিনি গোঁফের ফাঁকে মৃদু হাসির রেশ ছিটিয়ে বললেন, না বোঝার মতো কিছুই নেই।

এটা একটা জ্যান্ত ভূতের প্রতিকৃতি। যে গল্প তোমরা শুনছ, ধর সেই গল্পেরই নায়ক। কিছুক্ষণের মধ্যেই যার আবির্ভাব ঘটবে।

লম্বুদার কথা শুনে সকলেরই চোখ গোল গোল হয়ে উঠল। কিন্তু সেটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। কারণ ভূত ততক্ষণে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছে।

আমি লম্বুদার মুখের দিকে তাকাতেই লম্বুদা এবার আমাকে শুরু করার জন্য ইশারা করলেন।

আমি আর বিলম্ব করলাম না। চেয়ারে পা দুটো তুলে, একটু গুছিয়ে বসতে বসতে বললাম, তক্তপোষে বসে মূহূর্ত শুনছি। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ।

হঠাৎ ঘরের ছাদে 'ধুপ' করে একটা শব্দ হল।

নির্জন রাত বলেই হয়তো শব্দটা অত জোরে কানে বাজল।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং এর পরে কি ঘটলে কি করব তার একটা ছক তৈরী করতে লাগলাম।

আবার নিস্তব্ধতা নেবে এল। সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি না ঘটলেও, শব্দের কারণ নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে বিশ্রীভাবেই পাক খেতে লাগল।

একবার মনে হল সম্পূর্ণটাই মনের ভুল হয়তো। এমনও তো হতে পারে যেহেতু এ ধরণের কোনও ঘটনা আজ সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত, আমার মনের সেই কল্পনাটাই শব্দ ভ্রমেই কানে পৌঁছেচে।

অথচ আমি অযথাই ভয় পেয়ে মরছি এখানে বসে।

পরক্ষণেই আবার মনে হল, বাড়ীর সংলগ্ন নারকেল গাছটা থেকে কেউ ছাদের ওপর লাফিয়েও তো পড়তে পারে।

হয়তো বা জোড়া পায়ে লাফ মেরেছে বলেই এই শ-ব্দ!

এরপর যে সিঁড়ি ভেঙে নীচে আসবে না এমনইবা গ্যারান্টি কোথায়?

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন আমি আকাশ পাতাল এমন অনেক কিছুই চিন্তা করছি, হঠাৎ দ্রুত সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কে যেন নীচে নেবে গেল। আমি ঘর থেকে মুখ বাড়ালাম কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না।

মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। নিঃশ্বাসে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। জিদ ভরে এই দুঃসাহসিক কাজে পা বাড়ালাম বটে, কিন্তু তেমন

অশুভ কিছু ঘটে গেলে তখন আর আফশোষের অন্ত থাকবে না।

যাহোক অনুশোচনা করারও সময় নেই। আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম এবং রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। যদি কিছু চোখে পড়ে।

দীর্ঘ সময় কাটালাম সেখানে। এটাও মনের ভুল কি না ভাবছি, হঠাৎ ঘরের ভেতরে কাঠের জানালার পাল্লাগুলো দুমদাম বন্ধ হয়ে গেল।

এবার সত্যি সত্যিই ভয় হল এবং হাতের তালু দুটো হঠাৎ অসম্ভব রকম ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। বাড়ীর ভিতরে থাকা আর সমীচীন হবে কি না ভাবছি, রাতের জমাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল কুৎসিত স্বরে। প্যাঁচ্যর ডাক আগে বহু শুনেছি কিন্তু এমন কুৎসিত আর ভয়ার্ত ডাক কখনও শুনিনি।

যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে রইলাম প্যাঁচাটার দিকে। আকাশ পরিষ্কার ছিল বলেই তার ডানা নাড়াটা অনেকক্ষণ চোখে পড়ল।

প্যাঁচাটা অদৃশ্য হয়ে গেলেও তার কুৎসিত ডাকটা আমার কানে কেবলই বাজতে গালল। মনে হল সে যেন এই বাড়ীরই চারদিকে ডেকে ডেকে পাক খাচ্ছে।

এবার আমি পা পা করে এগিয়ে গেলাম সিঁড়ির দিকে। কয়েক ধাপ ওপরে চাতালটায় চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। কুচকুচে কালো বিড়াল একটা থাবা গেড়ে কটকট করে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে।

এই মুহূর্তে একটা নরখাদক বাঘ দেখলেও বোধহয় অতটা ভয় পেতাম না যতটা ভয় পেলাম বিড়ালটিকে দেখে।

চোখে চোখে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। যদি ভয় পেয়েও সে পালায়। কিন্তু সেরকম কোনও আভাস দেখতে পেলাম না তার মধ্যে। বরং তার দৃষ্টি আরও ভয়ার্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ইতিপূর্বেই আতঙ্কে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হবার উপক্রম হয়েছিল। বিড়ালটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার জামাও ঘামে ভিজে উঠল।

ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্য মুখে নানারকম শব্দ করলাম। হাত

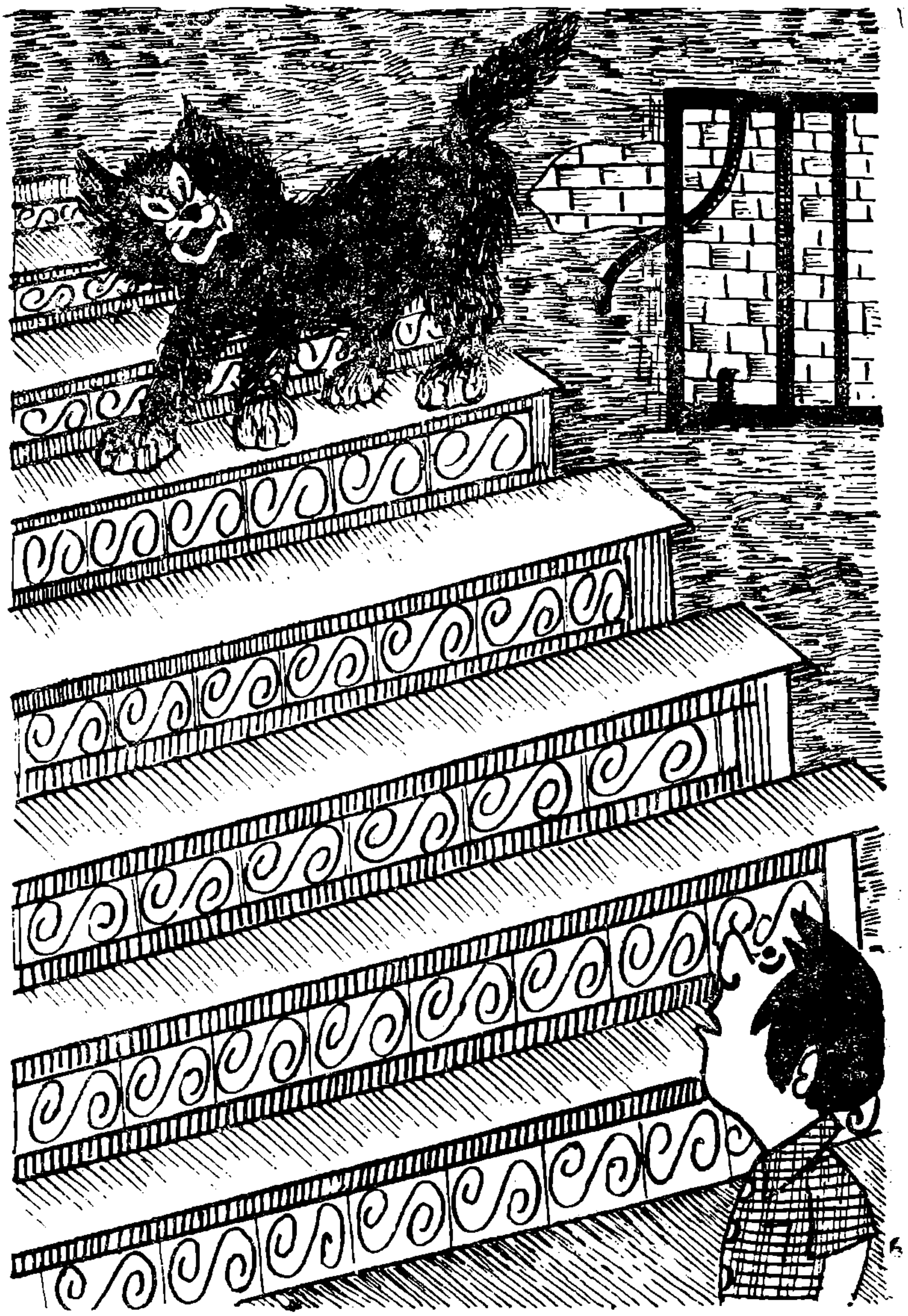

কটকট করে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে

পা ছুঁড়লাম কিন্তু তাতে সে বিন্দুমাত্র ঘাবড়াল না। গ্যাঁট হয়েই সেখানে দাঁড়িয়ে রইল সে এবং নিশ্চিন্ত মনেই লেজ নাড়তে লাগল।

এবার সত্যি প্রমাদ গুনলাম। বাড়ী থেকে বেরুতে গেলে এই সিঁড়ি ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। অথচ যেভাবে বিড়ালটি সিঁড়ি আগলে বসে রয়েছে,—কি করব ভাবছি। বিড়ালটি হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল এবং সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

নিজের অজান্তেই আমি পাঁচ সাতটা সিঁড়ি পেছিয়ে এলাম।

আমাকে পেছুতে দেখে বিড়ালটি আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি দেখলাম আর ওপরে উঠে কোনই লাভ নেই। যদি লাফ মারতে না পারি সরাসরিই বন্দী হয়ে পড়ব বাড়ীর ভিতর।

এখন বিড়ালটির নজর এড়ানো একান্ত প্রয়োজন। অন্ততঃ তাতে পালাবার পথও কিছুটা প্রশস্ত হবে।

বিড়ালটি পিছনে মুখটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি সিঁড়ির ধাপের সংলগ্ন মোটা সিমেন্টের আলটার আড়ালে চট্ করে সরে গেলাম।

এখন বিড়ালটি আমাকে দেখতে না পেলেও, আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। সে গা ভেঙ্গে দাঁড়াল এবং বড় বড় পা ফেলে সিঁড়ির পাশে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেল।

বিড়ালের উদ্দেশ্য বা পরিচয় যাই হোক, আমি আর সেখানে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন মনে করলাম না। জামা তুলে কপালে ঘাম মুছতে মুছতে, একরকম কয়েকলাফেই সদরে এসে দাঁড়ালাম।

ওপরে চোখ তুলতেই আবার বিস্ময়! বারান্দার রেলিঙের ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে বিড়ালটি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর চোখ দুটো তার আন্ধকারে আগুনের ভাঁটার মতোই জ্বলছে।

ঘামে জামাটা প্রায় ভিজেই গিয়েছে। হাত পা পুরোপুরিই ঠাণ্ডা, তাছাড়া রাত্রি জাগরণের ফলে শরীরটাও ঝিম ঝিম করছে। মোটামুটি সময় উত্তীর্ণ। আর থাকা প্রয়োজন হবে কিনা ভাবছি দাঁড়িয়ে।

এদিকে রাত আরও গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারটা ক্রমশঃ পাতলা হয়ে, চাঁদ উঠল আকাশে। চাঁদের আলোয় পরিচিত গাছপালা

ও ঘরবাড়ীগুলো দেখে মনে যথেষ্ট বল সঞ্চার হল। বাড়ী ফিরে যেতেও এখন কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু এখুনি ফিরে গেলে রণ্টুর কাছে মুখ দেখান ভার হবে। এরপর রণ্টু যে কোনওরকম ব্যঙ্গ করুক না কেন, নীরবেই তা সহ্য করতে হবে।

এলোমেলো এমন অনেক কিছুই ভাবতে ভাবতে বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল।

অন্যমনস্ক হয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম বিড়ালটি নেই। কোথায় যেন গা ঢাকা দিয়েছে।

বিড়ালটির এই আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধান যথেষ্টই সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়াল। বিড়ালটিই মণ্ডল পরিবারের কারুর অশরীরী আত্মা কী না কে জানে!

পিছন ফিরে ঘন ঘন তাকাতে লাগলাম। সেই বা আমার ওপর এমন তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে কেন?

সুমুখে ধানক্ষেতের পশ্চিম প্রান্ত বরাবর শ্মশানের রাস্তা। কারা যেন মড়া পুড়িয়ে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে।

তাদের কথাবার্তা স্পষ্টাস্পষ্টি শোনা না গেলেও বয়স যে সকলের কম তাদের কণ্ঠস্বর থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

এই মুহূর্তে মানুষের গলা পেয়ে যেমন সাহস পেলাম, তেমনই ভয় পেলাম মড়ার কথা স্মরণ করে।

এতক্ষণে হয়তো তার অশরীরী আত্মা এই ক্ষেতখামারেই কোথাও না কোথাও এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদিক সেদিক তাকাচ্ছি। কোন গাছের পাতা নড়ে উঠলেই মনে হচ্ছে সেটা বুঝিবা কোনও প্রেতাত্মার দ্বারাই ঘটছে।

থেকে থেকে ভীষণ ভয় পেয়েও যাচ্ছি। আবার যুক্তির ধাক্কায় সেই ভয় কেটেও যাচ্ছে।

হাতে ঘড়িও নেই। এখন ক'টা বাজে কে জানে। তবে অন্ধকারে স্বচ্ছতা দেখে মনে হচ্ছে ভোরের আলো ফুটতে আর বিশেষ দেরী নেই।

রন্টু নিশ্চয়ই এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে কি আর রাত জেগে বসে থাকার ছেলে!

বাড়ীর পথে দৃষ্টি মেলতেই বিস্ময়ের পালা। দূরে সুপুরী গাছটার তলায় একটা ছেলে নিচু হয়ে কি যেন কুড়োচ্ছে!

নিঃসঙ্গতা এমন আমায় পাগল করে তুলেছিল যে ছেলেটিকে দেখা মাত্রই আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম।

চীৎকার করেই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম।

প্রথমবার চীৎকারে তার কোনও সাড়া পেলাম না। দ্বিতীয়বার চীৎকার করতেই সে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকাল এবং সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ইশারায় তাকে ডাকতে সে উঠে দাঁড়াল এবং গুটি গুটি আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছে এসে দাঁড়াতে আমি প্রশ্ন করলাম, কী করছ তুমি ওখানে?

সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। যেন ভূত দেখল!

প্রশ্নটা সঙ্গত হয়নি ভেবেই আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম। হেসে বললাম, একটা বিশেষ কাজে এসেছি এখানে কিছুক্ষণ থাকতে হবে। একা থাকতে ভাল লাগছে না। তুমি যদি কিছুক্ষণ আমার কাছে থাক খুব খুশী হব।

আমার অনুরোধ শুনে সে চুপ করেই রইল। অনুরোধ রাখবে কি রাখবে না বুঝতে পারলাম না।

আকস্মিক এ ধরণের একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার জন্য বোধহয় সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। আমার সব প্রশ্নের উত্তরেই সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। কি যেন ভাবতে লাগল।

নীরবতা অবশ্য সম্মতিরই লক্ষণ। আমি সেই ভরসাতেই হাল ছাড়লাম না। আরও একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলাম। ওর কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করলাম, তোমার কি কোনও কাজ আছে? খুব কিঅসুবিধা হবে?

এতক্ষণে সে মুখ খুলল। ক্ষীণস্বরে বললে, না না অসুবিধা কি আর। আমি তো আছিই—

সে রাজী হতে আমি খুবই খুশী হলাম। হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে এসে বসালাম বাড়ীর সুমুখে ছোট চাতালটার ওপর।

নামটা জানার আগ্রহ হল। নাম কী?

প্রশ্ন করতেই সে বেশ একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হেসে বললে, নাম জেনে কী হবে?

বুঝলাম সে আমায় সঙ্গ দিতে রাজী হলেও, নাম ধাম প্রকাশে রাজী নয়। এটা অবশ্য এক একজনের স্বভাব থাকেও।

তার সঙ্গটাই যথেষ্ট, নাম ধাম জেনে আমারই বা কি হবে?

তাই আর পীড়াপীড়ি করলাম না। বললাম, তুমি এখানে থাকলে তোমার ভয় করবে না তো?

এই প্রশ্ন শুনে তার মুখের ভাব কিঞ্চিৎ পালটে গেল। বরং একটু উৎসাহ ব্যঞ্জক স্বরেই বলল, ভয়? কিসের ভয়? কাকে ভয়?

গেঁয়ো ছেলেরা সাধারণতঃ একটু সাহসীই হয়। তার এই ধরণের প্রশ্নে তাই আমি খুব অবাক হলাম না। আমিও তো গ্রামের ছেলেই বটে!

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বললাম, কেন ভূতের! এ বাড়ীতে ভূত থাকে তুমি জান না?

ভূ—ত! ভীরুতায় ভরা চোখ দুটো তার চকচক করে উঠল। ভূত এখানে থাকে শুনেছ কিন্তু স্বচক্ষে দেখেছ কখনও!

—না দেখিনি বটে। আর সেইজন্যেই তো আসা। যদি সশরীরে ভূতের দর্শন মেলে।

তবে একা থাকতে ঠিক মন চাইছে না। সেই জন্যেই তোমার সঙ্গ চাওয়া।

তুমি সঙ্গে থাকলে মনে একটু বল পাব এই আর কি।

ওঃ, সে একঝলক মৃদু হাসল। আমার কাছে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রশ্ন করল, ভূত কারা হয় বলতে পার?

ওর কৌতূহল আমি এড়িয়ে যেতে পারলাম না। বললাম, মৃত্যুর পর যে সব মানুষের আত্মার সদ্গতি হয় না পরলোকে তারাই ভূত হয়।

তাই নাকি? হঠাৎ সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল! আমার কাঁধে

হাত রেখে বললে, মানুষ মরেই তাহলে ভূত হয়।

আমি নীরবে ঘাড় নেড়ে তার কৌতূহল নিবৃত্ত করলাম।

ক্রমশঃ ওর সঙ্গে আমার ভাব জমে উঠল।

ও নিজে কোনও প্রসঙ্গের অবতারণা না করলেও, আমি যা বলতে লাগলাম তাতে মোটামুটি সায় দিতে লাগল এবং নিজেও টুকটাক মন্তব্য করতে লাগল।

সময়টা আগে যেমন কাটছিলই না, এখন যেন দ্রুত কাটতে লাগল।

এদিকে চাঁদও আকাশের মাঝামাঝি উঠে এসেছে। জোছ্‌নালোকে প্রায় দিনের মতোই ভ্রম হচ্ছে মাঠঘাটগুলো।

ভোর হতে যে আর বিশেষ বাকি নেই, মাঝে মাঝে পাখীর এলোমেলো কিচমিচ ডাক থেকেই তা অনুমান হচ্ছে।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল।

ছাদের পাঁচিলের গা থেকে একটা বালির চাবড়া খুলে পড়ল আমাদের সামনে। খুব জোর বেঁচে গেলাম। ওটা আমাদের যারই মাথায় পড়ত, নির্ঘাত তার মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

কোত্থেকে চাবড়াটা খসল দেখবার জন্য মুখ তুলে তাকালাম ওপর দিকে। এটা আদৌও দুর্ঘটনা না কারুর শয়তানি সেটাই জানার দরকার ছিল।

কিন্তু ওপর দিকে তাকাতেই এক বিপত্তি ঘটল। ঝুর ঝুর করে অজস্র বালি ঝরতে লাগল ওখান থেকে। মাথা সরিয়ে নিলেও বেশ কিছু বালি পড়ল চোখের ওপর এবং চোখ করকর করে উঠল।

এমনিই এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে সময় কাটছিল। চোখে বালি পড়তে মেজাজটা খুবই গরম হয়ে গেল। বললাম, নিশ্চয়ই ব্যাটা ভূতেরই কীর্তি।

ভূত না হলে এমন বজ্জাতি আর করবে কে? বালির চাবড়া পড়ার বা ওপর থেকে বালি ঝরার আর কি সময় ছিল না?

আমার এই মন্তব্য শুনেই সে তার হাতটা বাড়িয়ে রাখল আমার কাঁধেতে। কাঁধে কাঁধ স্পর্শ করে বললে, কি করে বুঝলে?

আমি বেশ বিরক্তি প্রকাশ করেই বললাম, এ আর না বোঝার মতো কি আছে? দেখছ না এত জায়গা থাকতে আমাদের মাথা বরাবরই পড়ল। আর কি পড়ার জায়গা ছিল না?

ব্যাটাকে একবার যদি বাগে পাই, টের পাইয়ে দেব কত ধানে কত চাল। পড়েনি তো আমার খপ্পরে?

আমার মন্তব্য শুনে সে কিন্তু কোনওরকম উচ্চবাচ্চ করল না। নীরবই রইল যদিও তার হাতটা পূর্ববৎ আমার কাঁধের ওপরেই রইল।

হঠাৎ……

হ্যাঁ, হঠাৎই মনে হল তার হাতটা কেমন যেন ভারী ভারী ঠেকছে। প্রথমে এটাকে নিছকই মনের ভুল ভেবে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু সেটা সাময়িক। উত্তরোত্তর চাপ বৃদ্ধি পেতে মনটা আবার সেখানে চলে গেল। তবে কি ইচ্ছে করেই সে এটা করছে?

পাশে মুখ ফেরাতেই বিস্ময়ের পালা! তার ছোট্ট দেহটা ধোঁয়ার মতোই হালকা হয়ে বাতাসে কাঁপছে।

হয়তোবা স্বপ্ন দেখছি ভেবে আমি দু'হাতে চোখ রগড়ালাম। চোখ খুলে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

কো—থা—য় গেল? আর গেলেইবা আমার কাঁধে তার হাত থাকবে কেন?

আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর পেলাম না। কিন্তু হাতের ভার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাঁড়াশির মতোই সেটা সেঁটে বসল আমার কাঁধের ওপর।

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল। চীৎকার করে উঠলাম কে? কে তুমি? বলো—

কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই। মনে হল যেন সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ মরে এই অশরীরীর পিছনে এসে ভীড় করেছে।

দেখতে দেখতে পূর্ব আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঁকি মারল। সূর্য ওঠা পর্যন্তই এই বাড়ীতে থাকতে হবে—এটার ওপরেই বাজী হয়েছিল রণ্টুর সঙ্গে। মোটামুটি সে শর্ত পূরণ হতে, আমি বিষণ্ণ মনেই বাড়ীর পথে রওনা হলাম।

লম্বুদার চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। ফস্ করে দেশলাইয়ের কাটিটা জ্বেলে চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, পুওর চাইল্ড।

মন্তব্যটা তিনি আমাকে করলেন না ভূতকে করলেন, ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য এ নিয়ে আর কোনওরকম্ গবেষণা না চালিয়ে আমি পুনরায় শুরু করলাম।

রন্টু বাড়ীর ছাদেই অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখামাত্রই সে দৌড়ে নেবে এল আমার সঙ্গে করমর্দন করতে। কিন্তু আমার মুখের চেহারা দেখে সে ঘাবড়িয়ে গেল।

কতক্ষণ আর সে ঘটনা গোপন রাখা যায়। ক্রমশঃ জানাজানি হতেই তুমুল হৈ-চৈ পড়ে গেল বাড়ীতে।

প্রথম প্রথম কেউই বিশ্বাস করতে চাইল না ব্যাপারটা। বরং এ নিয়ে নানারকম ঠাট্টা মস্করা চলতে লাগল।

কেউ বললে, নিশ্চয়ই ও কোত্থেকে গাঁজা বা ভাঙ কিছু একটা খেয়ে এসেছে। কেউ বললে, না না লেখাপড়া ছেড়ে দেবার এ এক ধরনের ফন্দী। আবার কেউ বললে, দেখ গে কোন অপেরায় নাম লিখিয়েছে। এটাও তো অভিনয়েরই অঙ্গ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি যখন খুবই বিব্রত বোধ করছি, পাড়ার এক পুরুত ঠাকুরই আমায় বাঁচালেন।

পুরুত ঠাকুরের একমাত্র ছেলে শশীভূষণের কাঁধে অনেককাল আগে একবার ভূত ভর করেছিল। তাই ঘাড়ে ভূত চাপলে কি কি লক্ষণ সাধারণতঃ প্রকাশ পায় তিনি ভালো ভাবেই জানতেন। এ খবর যথারীতি তাঁর কানে পৌঁছল।

আমার মধ্যেও সেই সব লক্ষণ দেখে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অর্থাৎ আমার ঘাড়েও ভূত চেপেছে। সেকথা তার মুখ দিয়ে প্রচার হতে সকলেই সভয়ে ও বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাতে লাগল।

রন্টু খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। আমার এই দুর্দশার মূল উৎস যে সে, সেই কথা উপলব্ধি করেই আর এখানে থাকা উচিত মনে করল না।

কারণ এজন্য ভবিষ্যতে উত্তম মধ্যম কয়েক ঘা তার পিঠে পড়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। অতএব এক্ষেত্রে পলায়নই একমাত্র বুদ্ধির পরিচয়।

স্কুল খোলার অজুহাতে সেই দিনই রণ্টু দিল্লী পাড়ী দিল। কারুর উপদেশই সে কর্ণপাত করল না।

এবার শুরু হল আমার চিকিৎসা।

আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা খবর পেয়ে দলে দলে আমাকে দেখতে আসতে লাগল বাড়ীতে এবং তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে লাগল মা ও বাবাকে।

কত মণ যে সরষে পুড়ল তার ইয়ত্তা নেই।

যে যা বলতে লাগল, সেই মতোই চিকিৎসা চলতে লাগল আমার। হেন টোটকা চিকিৎসা নেই যে হল না। কিন্তু লাভ কিছুই হল না। ভূত গ্যাঁট হয়েই চেপে বসে রইল আমার ঘাড়েতে। এক চুল নড়বার নাম করল না।

ঘরোয়া চিকিৎসা যখন ব্যর্থ হল ডাক পড়ল ওঝার।

ওঝা এসে নিবিষ্ট মনে সমস্ত ঘটনা শুনল। আমার দেহে হাত বুলিয়ে কি যেন অনুভব করার চেষ্টা করল, তারপর বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে, হুঁ, যা ভেবেছি তাই। বেশ জাঁদরেল ভূতই ঘাড়ে চেপেছে। এখন তার শক্তি পরীক্ষা করা একান্ত দরকার। ছোট ও বড় মিলিয়ে ক'টা পিতলের ঘড়া চাইল ঠাকুমার কাছে।

যথাসময়েই ঘড়া হাজির হতে, ওঝা সেগুলো জল ভর্তি করে আমাকে ডেকে বলল, তুমি দাঁত দিয়ে ধরে ঘড়াগুলো পাশের ঘরে নিয়ে যাও। ওঝার নির্দেশ শুনে তো বাড়ীশুদ্ধ লোকের চক্ষু ছানাবড়া।

দাদু বাধা দিয়ে বলল, না না এ সম্ভব নয়। তোমার পাগলামিতে বাছা আমার দাঁতগুলো খোয়াবে নাকি ?

ওঝা কিন্তু দাদুর নিষেধ মানল না, বললে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। ঘাড়ে ভূত চাপাতে এখন অসাধারণ শক্তির অধিকারী সে।

তবে কতখানি শক্তি সে ধরে সেটাই পরীক্ষা হবে এখন। এ থেকেই

বোঝা যাবে কী রকম আকৃতির ভূত চেপেছে ওর ঘাড়ে। এতে দাঁতের কোনও ক্ষতি হবে না। এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ওঝার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে দাদু অবশ্য আর বাধা দেননি।

ওঝার কথাই সত্যি হল। অক্লেশে আমি ঘড়া ক'টা কামড়ে ধরে নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে।

ওঝা খুবই গম্ভীর হয়ে গেল। বেশ চিন্তিত মুখেই বলল, হুম যা ভেবেছি তাই। বেশ বজ্জাত ভূতই ঘাড়ে চেপেছে। এর জন্য কড়া দাওয়াই দেওয়া দরকার। তার নির্দেশ মতোই বাড়ীর লোকেরা একদিন রাত আড়াইটের সময় আমাকে পানা পুকুরে চুবিয়ে আনল!

ভূত যদি শীত কাতুরে হয় এই দাওয়াইতে নাকি ভূত দেহ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু কিছুই কাজ হল না। জলে ভিজেও ভূত যথারীতি ঘাড়ে চেপেই বসে রইল।

একদিন চড়া রোদে গরম বালিতে সারা দুপুর আমাকে শুইয়ে রাখল।

এবারেও কিছু কাজ হল না। ভূত নাছোড়বান্দা।

ওঝা বেকায়দা দেখে শরীর খারাপের অজুহাতে সরে পড়ল। এবার অন্য ওঝার খোঁজ শুরু হল। আমার এক মামা মুর্শিদাবাদ থেকে একজন টপ র‍্যাঙ্কের ওঝা এনে হাজির করল বাড়ীতে।

সে পূর্বের চিকিৎসার ফিরিস্তি শুনে গুম মেরে গেল এবং মুখে বিড় বিড় করে কি সব বলতে লাগল। কাঁধেতে তার একটা বড় পুঁটুলি ছিল। সেই পুঁটুলিতে বাঁধা বই পত্তর ঘেঁটে কি সব দেখল। বাবাকে বললে, চিকিৎসা ভুল কিছু হয়নি। তবে ওষুধের মাত্রা আরও কড়া হওয়া দরকার। তিনগাছা মুড়ো ঝাঁটা চাই। এখনি আনিয়ে দিন চিকিৎসা শুরু করে দিই।

তখন সকলের মনের অবস্থা এমন পর্যায় এসে পৌঁছেচে যে ঝাঁটা চাইতে, কেউ আর কোনওরকম বাধা দিল না।

সেদিনই হাট বার ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনগাছা মুড়ো ঝাঁটা এসে গেল হাট থেকে।

ওঝা ঝাঁটা তিনগাছা গঙ্গার জলে ভাল করে ধুয়ে নিল। ঝাঁটার গায়ে তেল সিঁদুর মাখিয়ে বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ল। তারপর ঝাঁটা হাতে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। পরিণতিটা কেউই স্বচক্ষে দেখতে রাজী হল না। সকলেই একে একে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘর শূন্য হতে ওঝা দরজায় খিল এঁটে দিল। তারপর নির্মমভাবে ওই মন্ত্রপূত ঝাঁটা মারতে লাগল আমার পিঠের ওপর। দু'টো ঝাঁটা মুচড়ে ভেঙ্গে গেল কোনও কাজ হল না। ওঝা মুষড়ে পড়েই এবার তৃতীয় ঝাঁটায় হাত দিল।

তবে আর পেটাবার প্রয়োজন হল না। ওতেই ভূত নেবে গেল ঘাড় থেকে।

ভূতের হাত থেকে রেহাই পেলাম বটে, কিন্তু ঝাঁটার দাগের হাত থেকে রেহাই পাইনি বলে, আমি শার্টটা তুলে আমার পিঠটা দেখলাম সকলকে।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা 'ই-স্-স্-স' ধ্বনি-তরঙ্গ বহে গেল ঘরের মধ্যে। দু'একজন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ঝুঁকে পড়ল আমার পিঠের ওপর এবং বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

কেউ কেউ আবার সহ্য করতে না পেরে অন্যদিকেও মুখ ঘোরাল।

সকলেই যখন ওঝার এই নিষ্ঠুর আচরণের সমালোচনায় মুখর একজনের মধ্যে কিন্তু কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তিনি হলেন অদ্বিতীয় লম্বুদা। তিনি চোখ বুজিয়ে মৃদু হাসতে হাসতে অনর্গল চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার এই নির্বিকার ভাবসাব দেখে কিন্তু কেউই খুশী হতে পারল না। বিশেষ করে ভূতের নামে এই নির্মম নির্যাতনের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখাতে সকলেরই কৌতূহল বৃদ্ধি পেল এবং তাঁর এই নির্বিকার থাকার মূল কারণ জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

লম্বুদা সেটা অনুভব করলেও, অন্যমনস্কতার ভান করে বসে রইলেন। কেউ সেটা মুখ ফুটে প্রশ্ন না করলে যে তিনি সে প্রসঙ্গ তুলবেন না সেটা অনুমান করতে কারুরই অসুবিধা হল না।

আবার বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার প্রশ্ন উঠল।

সকলেই সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কে তুলবে? শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রজিৎ-ই মুখর হল। লম্বুদার উদ্দেশে বলল, আপনার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে আপনি বোধহয় কখনও ভূতের পাল্লায় পড়েন নি। পড়লে অন্ততঃ এতখানি নির্বিকার থাকতে পারতেন না এই লোমহর্ষক ঘটনা শোনার পরও।

লম্বুদা ঈষৎ চক্ষু ফাঁক করে ইন্দ্রজিতের দিকে তাকালেন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে একমিনিট তার দিকে তাকিয়ে থেকে, অদ্ভুত এক শব্দ করে গলা ঝেড়ে বললেন, রাইট ইউ আর মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড।

আমি জীবনে কখনও ভূতের পাল্লায় পড়িনি। তবে, হুম্…

লম্বুদা পুনরায় নীরব হয়ে ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন।

এখানেই ইতি টানবার বাসনা যদি তাঁর থাকত তিনি আর অহেতুক হুম্ বলে চুপ করে বসে থাকতেন না।

এই নীরবতা যে তাঁর সরবতারই পূর্ব লক্ষণ সেটা সকলেই উপলব্ধি করাতে হৈ-চৈ পড়ে গেল ঘরের মধ্যে।

আবার সকলে ঘুরে ঘুরে তাকাতে লাগল ইন্দ্রজিতের মুখের দিকে।

ইন্দ্রজিৎ যে আর খোঁচা দিতে রাজী নয় সেটা তার মৌখিক অভিব্যক্তিতেই ধরা পড়ে গেল। এমনকি সে তাকালও না কারুর দিকে।

ইন্দ্রজিতের মনোভাব প্রকাশ পেতে, শেষ পর্যন্ত বাস্তবই এ দায়িত্ব পালন করল।

লম্বুদাকে উদ্দেশ্য করে বললে, আপনার মুখনিঃসৃত 'তবে হুম্' শব্দদ্বয় আমাদের কাছে যথেষ্ট রহস্যময় ঠেকছে।

রহস্য উদ্ঘাটনের নির্মম যন্ত্রণার হাত থেকে আপনি যদি আমাদের উদ্ধার করেন আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।

লম্বুদা গুরুগম্ভীর চালে এক ঝলক হাসলেন। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, তুমি ভূতের পাল্লায় পড়েছিলে। কিন্তু আমার কেস স্বতন্ত্র। ভূতের পাল্লায় আমি পড়িনি, বরং ভূতই আমার পাল্লায় পড়েছিল বলে লম্বুদা হা-হা-হা করে হাসতে হাসতে বললেন—বেচারী!

লম্বুদার এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরে চমকের শিহরণ খেলে গেল। ভূতের পাল্লায় লোক পড়ে এটাই চিরকাল শোনা গিয়েছে। শুধু শোনাই বা বলি কেন দেখাও গিয়েছে এযাবৎ তাই।

কিন্তু এই প্রথম উল্টো কথা শোনা গেল। অর্থাৎ ভূত পড়েছে মানুষের পাল্লায়। স্বভাবতঃই সকলে যেমন একদিকে খুশীতে উল্লসিত হয়ে উঠল, তেমনিই কাহিনীটা শোনার আশায় গা ঝেড়ে উঠে বসলচেয়ারে।

মোটামুটি পরিবেশ শান্ত হতে, লম্বুদা এবার পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন এবং ওষুধে ফল ধরেছে দেখে ঘন ঘন ধূমপান করতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর ছেয়ে গেল। ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকায় লম্বুদার মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছিল্ না বটে, কিন্তু চুরুটের লাল আগুন ধক্ ধক্ করে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করছিল। লম্বুদা চায়ের ভাঁড়ে চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, ঠাণ্ডা বাড়ছে। বরফ পড়তে আর বিশেষ দেরী নেই। আর এক রাউণ্ড চা খেলে কেমন হয়।

প্রস্তাবটা তিনি করেছেন যখন, খরচ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েই সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলাম—এক্সেলেণ্ট!

গরম চা সহযোগে লম্বুদার গল্প প্রায় স্বর্গের অমৃতেরই সমান।

আমরা যখন মৌতের স্বপ্নে বিভোর লম্বুদা মাথা গুনতে শুরু করলেন। বিড় বিড় করে মনে মনে কী যেন হিসেব করে তিনখানা ছাতাধরা এক টাকার নোট প্যাণ্টের গোপন পকেট থেকে বার করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, শুধু চা কেন সঙ্গে কিছু টা-ও হোক।

চা পানের আনন্দেই আমরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম। টা-এর প্রস্তাব হতেই হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল ক্লাবঘর।

লম্বুদা মনে মনে খুশী হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। পায়ের ওপর পা তুলে বসে মৃদু নাচাতে শুরু করলেন।

সর্বসম্মতিক্রমেই এবার বিমলের ওপর চা আনার দায়িত্ব দেওয়া হল।

বিমল চিরকালই একটু নিরীহ প্রকৃতির। সচরাচর তাকে কোনও কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় না।

দায়িত্ব পেতে সে হাসি মুখেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চা না খাওয়া পর্যন্ত যে লম্বুদা মুখ খুলবেন না সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত ছিল। এই সময়টুকু কাটানোর জন্য চা-এর সঙ্গে 'টা'-টা কী ধরনের আসতে পারে সে নিয়ে একটা ছোটখাট গবেষণা শুরু হয়ে গেল।

অর্নব বললে, বিমল ভয়ানক মিষ্টিখোর। 'টা'-টা যখন নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়নি তখন ও নির্ঘাত এককাড়ি মিষ্টি কিনে আনবে।

কমল অর্নবের যুক্তিটা মানতে চাইল না। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করে বললে, তোর অনুমান ঠিক নয়। এই ক্লাবের লাইফ মেম্বার সে। আমরা কী খেতে ভালবাসি না বাসি জানে না সে এ কখনও হতে পারে!

আমার মন বলছে চায়ের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল জমে যেটা অর্থাৎ গরম তেলেভাজাই আনবে।

'নো স্যার' মিষ্টি বা তেলেভাজা কোনটাই আনবে না। আনবে 'ডালমুট' তোমরা দাঁতের ব্যায়াম শুরু করতে পার। লম্বুদা বেশ গম্ভীর চালেই কথাগুলো বলে, নড়েচড়ে বসলেন চেয়ারে।

আকস্মিক লম্বুদার এ ধরনের একটা মন্তব্যে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। বিমল কি আনবে না আনবে কিছুই বলে যায়নি। সবটাই যখন অনুমানের ওপর নির্ভরশীল, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদার এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে এই মন্তব্যের মূল উৎসটা জানবার জন্য সবাই উসখুস করতে লাগল। কিন্তু প্রশ্ন করার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব দেখা দিতে মোটামুটি প্রসঙ্গটা সেখানেই ধামা চাপা পড়ল।

অনুমান শেষ পর্যন্ত মিলল লম্বুদারই।

বিমল ঘরে ঢুকে ডালমুটের ঠোঙাটা টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, চা আসছে। শুরু করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা মৃদু সোরগোলের ঝড় বহে গেল লম্বুদার অনুমানকে ঘিরে।

তিনি আমার হাত দুয়েক ব্যবধানে বসেছিলেন। আমি জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে লম্বুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনার অনুমানের ভিত্তিটা অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

লম্বুদা মুখটা ছুঁচলো করে বললেন, সিমপ্‌লি কমনসেন্স !

তোমাদের এখানে আসার পথে বনমালীর তেলেভাজার দোকানে যে লাইন দেখে এসেছি সেই লাইনে যদি বিমল গিয়ে দাঁড়াত, তেলেভাজা পেতে পেতে তার আগামীকাল বিকেল হয়ে যেত।

নিশ্চয় সে ও ঝুঁকি নেবে না।

এবার মিষ্টি প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি দিয়েছি তিন টাকা। বাইশ ভাঁড় চায়ের দাম দু টাকা পঁচাত্তর পয়সা। বাকী থাকে পঁচিশ পয়সা।

ওই পয়সায় বাইশটা বোঁদেও হবে না, রসগোল্লা পান্তুয়া দূরে থাকুক। অতএব মিষ্টি কেনার কথাই উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে অন্যকিছু কেনাই স্বাভাবিক। যেহেতু ডালমুটের দোকান পাশেই, সে যে ডালমুট আনবে এতে আর সন্দেহ কি। লম্বুদা বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই হাসলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম করমর্দনের জন্য। তিনি কোনও সঙ্কোচ না করে সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রত্যুত্তর দিলেন।

ডালমুট হাতে হাতেই ভাগ হয়ে গেল। প্রথম সমান ভাগেই ভাগ হল, পরে প্রত্যেকেই নিজের অংশ থেকে দু'টি করে তুলে দিল লম্বুদাকে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে।

লম্বুদা যে একটু লোক দেখানো আপত্তি না করলেন তা নয়। সেটা নেহাৎ-ই সাময়িক।

ইতিমধ্যেই চা এসে হাজির হল।

লম্বুদা প্রথম ডালমুট ফেললেন মুখে। গোল গোল চোখ করে ডালমুট চিবুতে চিবুতে বললেন, এ কী আর ডালমুট। ডালমুট খেয়েছিলাম সেবার ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে। আ-হা, তার স্বাদের কথা ভাবলে এখনও আমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি ঠোঁট চেপে মৃদু হাসলেন।

ইন্দ্রজিৎ আর জিহ্বা সংযত করতে পারল না! সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে উঠল, রাজকীয় ব্যাপার যখন ডালমুটের ডালগুলো কী সোনার ছিল লম্বুদা ?

রাইট ইউ আর। লম্বুদা কণ্ঠস্বর এক পর্দা ওপরে তুললেন! সোনা-

মুগের ডালই ছিল কিন্তু সেটা তো আমার বক্তব্য নয়। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হল গিয়ে ইংলিশ আর বেঙ্গলী প্রিপারেশনে আকাশ পাতাল ফারাক! ওরকম বিচিত্র স্বাদের ডালমুট যে বয়সে মুখে পড়বে, সেই বয়সের নড়চড় হবে না। বন্ধ ঘড়ির মতোই কাঁটা স্থির হয়ে থাকবে।

লম্বুদা ইন্দ্রজিতের দিকে তাকালেন।

ইন্দ্রজিতেরও জিদ চেপে গেল। লম্বুদার উদ্দেশে বলল, আমাদের ভাগ্যে তো আর ওই ঐতিহাসিক ডালমুট জুটবে না। আপনি যদি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেন, শ্রবণেন অর্দ্ধ ভোজনম্ হয় আর কি।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বলব বৈকি! লম্বুদা গোগ্রাসেই ডালমুটগুলো নিঃশেষ করলেন। চায়ের ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, এই তো সেদিনের কথা। দেখতে দেখতে কতগুলো বছর কেটে গেল।

ইংল্যাণ্ডের রাণীর রাজ্যাভিষেক, বুঝতেই পারছ কি এলাহি ব্যাপার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। আমিও সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হাজির হয়েছি ওখানে।

যথাসময়েই রাজকীয় প্রথায় রাণীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হল।

সেই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান শেষ হতে রাণীকে আহ্বান জানানো হল এই অনন্যসাধারণ ভোজসভায় যোগদানের জন্য। বিশ্বের সম্মানীয় ব্যক্তিদের সাথে তাঁর পরিচয় করে দেওয়া হবে।

যথারীতি পরিচয় পর্ব শেষ হতে রাণী সকলকে সেই ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানালেন।

সে কি এলাহি ব্যাপার! নিমন্ত্রিতদের সুবিধার জন্য সব দেশীয় খাবারই সেখানে রাখা হয়েছে। যাতে আপন আপন রুচি মতোই সকলে খেতে পারেন। ভারতীয় খাবারের সমাবেশ হয়েছে যেখানে, খুঁজে খুঁজে সেখানেই হাজির হলাম। সিঙ্গী মাছের ঝোল থেকে শুরু করে মুরগী মসল্লম—সবই আছে। কি খাই সেটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। একবার মনে হচ্ছে বাংলা খানা খাই, পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে ও তো রোজই খাই। তার চেয়ে পাঞ্জাবি খানা খাই। আবার মনে হচ্ছে—মেনু নিয়ে যখন বিব্রত ঠিক সেই মুহূর্তে ডালমুটটা পড়ে গেল সামনে।

ডালমুট আমার চিরকালের প্রিয়। ডালমুট পেলে আমি দুবেলা ভাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারি।

অতএব নির্বিচারে এক চামচ ডালমুট মুখে পুরে দিলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল।

লম্বুদা কয়েক সেকেণ্ড চোখ পিট পিট করলেন। হ্যাঁ, ডালমুট মুখে দেওয়া মাত্রই মুখটা কখনও ঝাল, কখনও মিষ্টি, কখনও টক, কখনও তেতো আবার কখনও নোনতা হয়ে যেতে লাগল।

একসঙ্গে এতরকম টেষ্টের ডালমুট কখনও খাইনি। বেয়ারাকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, এই ডালমুট কোন দোকানের বলতে পার?

সে বড় বড় চোখ করে বললে, এ জিনিষ দোকানে পাবেন কোত্থেকে? খাস রাজবাড়ীর পাকঘরে তৈরী। রাজপ্রাসাদের টি টেবিলে এই ডালমুট থাকে।

আমি আর লোভ সামলাতে পারলাম না। প্রায় পাঁচশো গ্রামের মতো ডালমুটই খেয়ে ফেললাম সেদিন। লম্বুদা নীরব হয়ে পা নাচাতে শুরু করলেন।

পাঁচশো গ্রাম ডালমুট খেলেন···বিপ্লব অচৈতন্য হবার ভান করে ঢলে পড়ল চেয়ারের হাতলে।

লম্বুদা আড়চোখে তাকালেন সেদিকে। মুখের ভেতর থেকে একরাশ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ব্যাঙ ভাবে ডোবাই বুঝি জগৎ! আর ডোবার ভেতরে যা আছে সেটাই বোধহয় জগতের ঐশ্বর্য।

কিন্তু ডোবার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে এটা তাদের বিশ্বাস করানোই শক্ত। অবশ্য কোনওদিন যদি মুখ বাড়ায় দেখতে পাবে ঐশ্বর্যভরা অপর জগৎকে! লম্বুদা বিপ্লবের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বেশ ঝাঁঝালো স্বরেই কথাগুলো বলে উঠলেন এবং পুনরায় চোখ বুজিয়ে ধূম পানে মন দিলেন।

লম্বুদা সাধারণত উত্তেজিত হন না। তাঁকে জবরদস্তি উত্তেজিত না করার জন্য আমরা সকলেই বিপ্লবকে ইশারা করলাম।

বিপ্লব অবশ্য সেটা উপলব্ধি করতে পেরেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসল।

লম্বুদা চোখ বুজিয়ে বসে গুণ গুণ করে কি যেন একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগলেন।

এবার সকলেই তাকাল ইন্দ্রজিতের দিকে। আমাদের আর্জিটা বুঝতে তার কোনই অসুবিধা হল না। সঙ্গে সঙ্গেই খুক খুক করে দু'বার কাশল। লম্বুদার কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বলল, এবার আপনার ঐতিহাসিক ঘটনাটা কি আমাদের উপহার দেবেন?

ঐ-তি-হা-সি-ক? লম্বুদা বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন। পরমুহূর্তেই একগাল হেসে বললেন, হ্যাঁ তা বলতেই পার। অবশ্য না শুনে নয়। আমি বলছি। তোমরা শোন তারপর বলবে এটা ঐতিহাসিক কি না?

লম্বুদা নীরবে ধূমপান করতে লাগলেন। আমরা ধৈর্য ধরে মুহূর্ত গুনতে লাগলাম।

ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা যথারীতি ঘুরেই চলেছে। ন'পাক শেষ করে দশ পাক ছুঁতেই লম্বুদা সরব হলেন। তা বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। তখন আমি সবে তারুণ্যে পা দিয়েছি। রক্ত চন চন করছে।

মনে হাজার রকম সখ। তারমধ্যে অবশ্য শিকারের সখটাই বেশী। কোথায়ও বাঘ ভাল্লুকের গন্ধ পেলেই হল, বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে দৌড়ই। একটা গুলিই যথেষ্ট। কদাচিৎ আমাকে দুটো ছুঁড়তে হয়।

অনেকদিন শিকারে বেরোইনি। হাতটা কিছুদিন ধরেই নিস্ পিস্ করছিল।

হঠাৎ একদিন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিরেক্টর মিঃ কল্যাণ চক্রবর্তী আমায় ফোন করলেন। যথারীতি কুশল বিনিময়ের পর বললেন, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমরা আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। যদি দয়া করে সাহায্য করেন আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। দেশের কাজ করব এ আর বলার কি আছে। এখন বলে ফেলুন কি করতে হবে—

মিঃ চক্রবর্তী বললেন, ঝিলার জঙ্গল থেকে একটা নরখাদক বাঘ নিয়মিত নদী পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে গোরু ছাগল তো খাচ্ছেই। গত সপ্তাহে

তিনজন গ্রামবাসীরও ঘাড় মটকে দিয়ে গিয়েছে।

এ ব্যাপারে অনবরত অভিযোগ আসছে গ্রামবাসীদের তরফ থেকে আমাদের দপ্তরে। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি জনস্বার্থে বাঘটিকে অবিলম্বে মেরে ফেলা দরকার। কারণ রক্তের স্বাদ একবার যখন সে পেয়েছে, তার স্বভাব পাল্টানো খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। তাই আমরা আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। এই ধুরন্ধর বাঘটিকে আপনি যদি মারতে পারেন, আমরা নগদ পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেব ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেঘ না চাইতেই জল। এমন সুযোগ ছাড়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গেই আমি টোপ গিললাম।

মিঃ চক্রবর্তী আমায় সবরকমের সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হলেন এবং এও বললেন, নদী পার হয়ে ঝিলার জঙ্গলে আপনার যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটা লনচ্ও দেওয়া হবে আপনাকে।

আমি সানন্দেই তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। কারণ এট আমার কাছে একটা সুবর্ণ সুযোগই মনে হল।

মিঃ চক্রবর্তী আমায় তাঁর গাড়ীতে লিফট দিলেন চেকপোষ্ট পর্যন্ত। সামনেই ঝিলা নদী, জোয়ারে তখন ফুঁসছে।

আমি গাড়ী থেকে নামামাত্রই সে খবর রটে গেল সারা গ্রামাঞ্চলে। স্থানীয় অধিবাসীরা এসে আমায় ঘিরে ধরল। বাঘটির ব্যাপারে সকলেই উদ্বিগ্ন। কেউ বললে আমার গোরু খেয়েছে, কেউ বললে আমার শুয়োর খেয়েছে, কেউ বললে, আমার ছাগল খেয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাদের ছেলে মেয়ে খেয়েছে তারাও অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের কাহিনী আমায় শুনিয়ে বাঘটির হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা জানাল।

সকলের কথাই আমি মন দিয়ে শুনে বললাম, দেখি আমি কী করতে পারি। তবে আমার একার দ্বারা তো সম্ভব নয়। অচেনা অজানা জায়গা তোমাদের সাহায্যও প্রয়োজন।

বাঘ আমিই মারব। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে এই অভিযানে থাকতে প্রস্তুত অবিলম্বে জানাও।

প্রস্তাবটা করামাত্রই গ্রামবাসীদের ভীড় হালকা হতে শুরু হল।

কাজের কথা মনে পড়ে যেতে একে একে সবাই এদিক ওদিক সরে পড়তে লাগল।

শেষ পর্যন্ত টিকল তিনজন। অধীর, পরান আর অটল।

অধীর মণ্ডলের বয়স কুড়ি কি বাইশ। সামনেই তার বাসা। বাসায় বিধবা মা আর ছোট বোন আছে।

পরান ও অটল দুই খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই এবং দুজনেই খুব শিকারে উৎসাহী।

মিঃ চক্রবর্তী সেখানে হাজির ছিলেন। ওদের তিনজনের নাম ঠিকানা টুকে নিয়ে বললেন, তোমরা লম্বুবাবুকে সাহায্য কর। এজন্য মোটা পারিশ্রমিক মিলবে।

ওরা সকলেই সাগ্রহে সম্মতি জানাল।

লনচ্ তৈরীই ছিল। সকলে মিলে লনচে চড়ে আমরা ঝিলা নদী পেরিয়ে ঝিলা ব্লক প্রান্তে উপস্থিত হলাম। কয়েক'শ গজ দূরেই গরান আব গেঁউয়া গাছের নিবিড় জঙ্গল শুরু হয়েছে।

মিঃ চক্রবর্তী বনের গভীরে না গেলেও সীমারেখা থেকেই বনের পরিধি, গভীরতা, বাঘের আস্তানা এবং কোনপথে বাঘ সাধারণতঃ যাতায়াত করে সে সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনালেন এবং বাঘ শিকারের জন্য মাচাটা কোথায় বাধা উচিত সে সম্পর্কেও নির্দেশ দিলেন।

মোটামুটি জরীপের কাজ সেরে আমরা লনচেই ফিরলাম। তবে লনচে থাকতে ইচ্ছা হল না।

রাতটা অধীর মণ্ডলের বাড়ীতেই কাটাব ঠিক করলাম। মিঃ চক্রবর্তী অবশ্য তাঁর কোয়ার্টারেই ফিরে গেলেন।

রাতটা অধীরের বাড়ীতে ভালোই কাটল। বজ্জাত বাঘটা মারার দায়িত্ব আমি নিয়েছি শুনে আমাকে প্রায় দেবতার মতোই তারা আদর আপ্যায়ন করল।

সকাল হতেই আমরা চারজন লনচে চড়ে গন্তব্যস্থলে যাত্রা করলাম। লনচে নদী পেরোতে আর কতক্ষণ লাগে। আমরা যথাসময়েই ওপারে

গিয়ে হাজির হলাম। যদিও সূর্য তখন অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে, কিন্তু বনের ভেতর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

আমরা বনের বেশ কিছু গভীরে গিয়ে মাচা বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সঙ্গীদের মধ্যে অধীরই আমাকে বেশী সাহায্য করতে লাগল। মাচা বেঁধে জলখাবার ও শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ওপরে তুলে দিয়ে বললে, আর কী করতে হবে বলুন—

আমি বললাম, কিচ্ছু না। যা করেছ যথেষ্ট। এত ঘটা করে আমি জীবনে কখনও বাঘ মারিনি।

সেদিন রাতটা মাচাতেই কাটল। মাচাটা বাঁধা হয়েছিল ভালোই কিন্তু উচ্চতা কম হয়ে যাওয়ার জন্য অসুবিধাই হচ্ছিল। বেশী দূর লক্ষ্য যাচ্ছিল না। অসুবিধার কথাটা অধীরকে বোঝাতে, সে বলল, অত বড় বাঁশ যোগাড় করাই তো মুশকিল।

জঙ্গলের ভেতর থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে এখন যাওয়া তো বিপজ্জনক। বাঘ শিকার করতে গিয়ে শেষকালে কি আমরাই বাঘের পেটে যাব নাকি? একমাত্র উপায় হল নদীর ওপার থেকে দেখেশুনে বাঁশ নিয়ে আসা। কিন্তু এই ছোট লনচে করে কি তা আনা সম্ভব—ভেবে দেখুন।

আমি আর অধীরকে চাপ দিলাম না। বললাম, ঠিক আছে মাচা উঁচু করার আর প্রয়োজন নেই। পাশেই যে বেলগাছটা রয়েছে, ওটার মাথায় উঠলেও আমার কাজ হয়ে যাবে। তোমরা তিনজনে বরং মাচার ওপরে থাক। দরকার হলেই আমি ওখান থেকে তোমাদের ডেকে নেব।

পরান আপত্তি জানিয়ে বললে, বেলগাছের মাথায় রাত কাটাবেন কি করে। গাছের ওপরে কি শোওয়া বসার জায়গা আছে?

আমি বললাম, সে জন্য চিন্তা নেই। গাছের মাথায় উঠে কিছু ডালপালা ছেঁটে ফেললেই হবে। বড়জোর দু'রাত। দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

আমার কথা শুনে অধীরের মুখ শুকিয়ে গেল। কানের কাছে মুখটা নিয়ে এসে বললে, কী বলছেন স্যার কাল না ভূতচতুর্দশী। এই তিথিতে কেউ কখনও বেলগাছে চড়ে রাত কাটায়! ভূতের পাল্লায়

পড়ে শেষকালে বেঘোরে প্রাণ হারাবেন নাকি ?

শুনে আমি হো-হো-হো করে হেসে উঠলাম। ভূ—ত! ধ্যুৎ! ভূত পুত আমি মানি না। ওজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না! তুমি বরং গাছের ডালপালাগুলো কাটবার ব্যবস্থা কর। আমি তো ওসব ব্যাপারে খুব অভ্যস্ত নই।

আমার কথা শুনে অধীরের প্রায় হৃৎকম্প উপস্থিত হল। সে হাতজোড় করে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে, সাহেব এখানকার ভূতেদের আপনি চেনেন না। এরা ভয়ানক বজ্জাত। যার পেছনে লাগবে তাকে গ্রাম ছাড়া করে ছাড়বে। দয়াকরে এ ব্যাপারে আমাদের জড়াবেন না। ভিটে ছেড়ে আমরা কোথায় যাব ?

অধীরের অবস্থা দেখে আমার করুণা হল। পরান ও অটল মুখ ফুটে কিছু না বললেও, ওরা যে অধীরেরই দলে, সেটা তাদের হাবভাব থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। অযথা ওদের বিব্রত না করে বললাম, ঠিক আছে তোমাদের কিচ্ছু করতে হবে না! আমি নিজেই সব করে নিচ্ছি। ভূত চাপলে আমার ঘাড়েই চাপবে।

গাছে উঠে আমি নিজেই কুড়ুল দিয়ে ডালপালা ছেঁটে বসার জায়গা করতে লাগলাম। ওরা দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার। দুটো মোটা ডাল কাটতেই সারা দুপুর কেটে গেল এবং বিকেলে বেশ ক্লান্ত লাগতে লাগল।

গাছ থেকে নামতে অধীর হাত কচলাতে কচলাতে বলল, সাহেব আপনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমার বাসায় চলুন। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে এখানে আসবেন। ওটাও তো প্রয়োজন।

অধীরের প্রস্তাবটা আমি প্রত্যাখান করতে পারলাম না। ও বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রাজী হয়ে গেলাম। লনচের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল।

নদী পার হয়ে যথারীতি অধীরের বাসায় হাজির হলাম। হাত পা ধুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর, খেতে বসে দেখি এলাহি আয়োজন করেছে তার মা। মুরগীর ঠ্যাঙই দিয়েছে গুনে গুনে দশটা। আমি একটু

ইতস্ততঃ করতে অধীরের মা বলল, আমরা গরীব মানুষ। কি আর খাওয়াব তোমাকে। চাষের মুরগীর মাংস আর গোরুর দুধের ক্ষীর করেছি।পেট ভরে খেয়ে নাও বাবা। রাত কাটাতে হবে তো গাছে।

দুটো মেনুই আমার প্রিয়। তাছাড়া এমন টাটকা জিনিষ আর পাব কোথায়? বেশ তারিয়েই খেতে লাগলাম। রান্নাটাও আবার উত্‌রে গিয়েছিল—লম্বুদা হঠাৎ একটু ছোট্ট ঢেকুর তুলে বললেন এখনও ঢেকুর ওঠে অবশ্য সেই ভোজের কথা মনে পড়লেই। লম্বুদা মৃদু হাসতে হাসতে তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে।

এটাই পৃথিবীর সর্বশেষ আশ্চর্য কিনা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল বিমল। ইন্দ্রজিৎ বাধা দিল। তার কানে মুখটা লাগিয়ে ফিস ফিস করে বললে, ঘাঁটাসনি। এখনি আর এক ইতিহাস শুরু হয়ে যাবে!

দু'একটা ঢেকুর যদি একান্তই ওঠে উঠতে দে। ঢেকুর আটকে দিলে সবকিছুই আটকে যেতে পারে।

বিমলের প্রশ্ন করা থেকে নিবৃত্ত হওয়াটা লম্বুদার চোখ এড়াল না। তিনি বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন!

দু'মিনিট এইভাবেই কাটল। হঠাৎ মুখে একটু বিরক্তভাব ফুটিয়ে বললেন, খাওয়ার শেষে পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে আবার লনচে চেপে বসলাম! ওরাও তিনজনে আমার সঙ্গে লনচে উঠল। লনচ্ পৌঁছল বটে, কিন্তু ওরা তিনজনে কেউই লনচ্ ছেড়ে নামতে চাইল না।

কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ওরা তিনজনেই আমতা আমতা করতে লাগল। পরানই প্রথম মুখ খুলল! বলল, আপনি বেলগাছ কেটে ভাল কাজ করেন নি সাহেব বিশেষ করে এরকম একটা মারাত্মক তিথিতে।

কিছু মনে করবেন না। আমরা লনচে থাকব। আপনার দরকার পড়লেই আমাদের ডাকবেন। আমি দেখলাম সংস্কারটা মানুষের মনের ব্যাপার। এ ব্যাপারে জোর করার কোন মানে হয় না। কাজের চেয়ে এতে অঘটনের আশঙ্কাই বেশী। ওদের লনচে রেখে আমি একাই ডাঙ্গায় উঠলাম।

সূর্য অস্ত গেলেও এখনও কিছু আলো রয়েছে। হয়তো বা আর

কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে ঢেকে যাবে চারদিক। যা কিছু করার এখনি করতে হবে।

বাঘের পায়ের ছাপের সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম এদিক ওদিক। সরকারী নারকেল বাগানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, গরান গাছের ঝোপের ভেতর সবে দু-পা এগিয়েছি হঠাৎ উৎকট গন্ধ নাকে এল।

গন্ধটা যে কোনও পচনশীল জিনিষের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই কারণে কৌতূহলটাও বেড়ে গেল। একটু সাহস করে সেই গন্ধের সূত্র ধরেই এগিয়ে গেলাম। ঘন গাছের জন্যেও বটে, আলোর স্বল্পতার জন্যেও বটে বস্তুটাকে দেখা যাচ্ছিল না। ব্যাগ থেকে টর্চটা বার করে জ্বালাতেই চমকে উঠলাম। একটা হরিণের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে সেখানে।

এটা যে কোন বাঘের কাজ সে বিষয়ে নিশ্চিত। বিশেষ করে তার ঘাড়ে যে কামড়ের দাগ রয়েছে বাঘ ছাড়া আর কিসেরই বা অমন কামড়ের দাগ হতে পারে।

দুষ্কর্মটা কবে নাগাদ হয়েছে মোটামুটি আঁচ করার জন্যই ঝোপের ভেতর পা বাড়ালাম। কাছাকাছি পৌঁছে তার উপর টর্চের আলো ফেলতেই দেখলাম—যা অনুমান করেছি মোটামুটি তাই! বড় জোর একদিন কি দু'দিন আগেই ঘটনাটা ঘটেছে। কারণ রক্তটা তখনও পুরোপুরি শুকোয় নি এবং তার ওপরে মাছি বসছে।

হরিণের ঘাড়ে যে কামড়ের দাগ রয়েছে, তা থেকে মোটামুটি বাঘের আকৃতিটা অনুমান করা যায়। কম করে সাত আট ফুটের কম তো নয়ই। বেশীই হবে। তবে কাণ্ডটি যে ওই বাঘটির তাতে কোনই সন্দেহ রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটাকে মারার জন্য একরকম প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম মনে মনে।

আশে পাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলছি এলোমেলো দু'চারটে পায়ের দাগও চোখে পড়ছে। কিন্তু সেগুলি বিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্দেশ্য কিছুই সফল হল না।

হতাশ হয়েই ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়। রাইফেলটা ঘাড়ে নিয়ে ডালে ডালে পা দিতে দিতে বেলগাছ শীর্ষে উঠে গেলাম এবং

চোখে বায়নাকুলারটা লাগিয়ে চারদিকে নজর রাখতে লাগলাম।

আঁধার নামলেও এখন পুরোপুরি গ্রাস করেনি। জন্তুজানোয়ারের মুখ চেনা না গেলেও প্রতিকৃতি চেনা যাচ্ছে। তবে নদীর ওপারে গ্রামগুলোতে এখনি হাতে হ্যারিকেন ঝুলিয়ে চলতে ফিরতে দেখা যাচ্ছে মানুষকে।

পশ্চিম প্রান্তে একটি মন্দির থেকে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে। সম্ভবতঃ সেখানে সন্ধ্যারতি হচ্ছে।

চোখের সঙ্গে সঙ্গে কানকেও সজাগ রাখতে হচ্ছে আমার। কারণ অনেক সময়েই বাঘেরা ঝোপঝাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করেই শিকার ধরতে এগিয়ে যায়। এ-কাজে বিলম্ব হওয়া মানেই শিকার ফসকে যাওয়া।

ওদিকে লনচের মধ্যে এতক্ষণ একটা বাতি জ্বলছিল। যে কারণেই হোক বাতিটা নিভে গিয়েছে। কিন্তু জ্বালাবার আর কোনরকম চেষ্টা চোখে পড়ছে না। হয় বাতিটা আপনিই নিভে গিয়েছে আর না হয় ওরা নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়তে ওদের কোনই অসুবিধা নেই। কারণ রাতের আহারের পার্ট তাদের অনেক আগেই মিটে গিয়েছে। এখন একটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ কি।

তাছাড়াও বেল গাছে যখন উঠবে না বলেই ওরা জিদ ধরেছে অযথা ওদের জাগিয়ে রেখে লাভ নেই।

রাত ক্রমশঃ বাড়ছে।

আমার উত্তেজনাও বাড়ছে ধিকি ধিকি করে। কোথায় কোনও শব্দ শুনলেই চমকে উঠছি। রাইফেলটা বাগিয়ে ধরছি পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার নিজেকে সামলে নিচ্ছি।

যে বেলগাছের মাথাতে আমি চড়ে বসেছিলাম, তার তলাতেই হঠাৎ খড় খড় করে একটা শব্দ হল। আমি উৎকীর্ণ হয়েই বসেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই চোখে বায়নাকুলার রাখলাম কিন্তু দর্শনীয় কিছুই চোখে পড়ল না।

তবে নীচে অনেক গাছের শুকনো পাতা খসে পড়েছিল।

তার ওপর দিয়ে সাপ জাতীয় কিছুর চলা ফেরাই যে এই শব্দের

— বায়নাকুলারটা চোখে লাগিয়ে চারিদিকে নজর রাখতে লাগলাম।

উৎস, অনুমান করে আবার নজর ফেরালাম।

কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। অনুরূপ শব্দ আবার ভেসে এল গাছের তলা থেকে। এবার নীচের দিকে তাকাতেই চক্ষুস্থির। গাছের মাথা থেকে যে বেলডালগুলো ছেঁটে ফেলে দিয়েছিলাম, সেগুলোর মধ্যে যেটা পুষ্ট সেই ডালটা ভুঁয়েতে আপনি নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার বটে। চোখের ভুল মনে করে চোখ দুটো রগড়ালাম। কিন্তু চোখ খুলে পূর্বের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখলাম।

টর্চটা গলাতেই ঝোলানো ছিল। টর্চের আলো তার ওপরে ফেললাম। ঠিক তাই। জীবজন্তু যেমন পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ায়, গাছের ডালটাও তেমনি চলে বেড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ মনে হল বাতাসে এটা হচ্ছে না তো? কিন্তু অত মোটা ডাল নাড়াবার মতো জোরাল বাতাসই বা কোথায়?

এবার মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঞ্চার হল। এমন একটা অলৌকিক কাণ্ড দেখার মতো মানসিক প্রস্তুতি ছিল না তখন আমার।

নদীর ওপারে গ্রামে আলোর নামগন্ধ নেই। গাঢ় অন্ধকার! মাঝে মাঝে কেবল কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। এই অন্যমনস্কতার সুযোগে বাঘ যাতে চোখে ধুলো দিয়ে না পালায় সেদিকেও নজর রাখতে হচ্ছে।

দু'দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা ক্রমশঃ আমার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল। ভাবলাম লনচে তো ওরা তিনজন আছেই। ওদের ডাকলেই তো হয়।

আবার পরমুহূর্তেই মনে হল চেঁচামেচি করলে, বাঘটা যদি কাছাকাছি কোথাও থেকেও থাকে সাবধান হয়ে যাবে। আর সে এধারেই মাড়াবেনা। সব পরিশ্রমই বিফল হবে।

অতএব চীৎকার না করাই বাঞ্ছনীয় এই মুহূর্তে।

হাতে রাইফেলটা ছিল। কী করি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল গুলি ছুঁড়েও তো থামিয়ে দিতে পারি। রাইফেল হাতে রয়েছে যখন শুধু ট্রিগার টিপলেই হল! দেখিই না! ট্রিগার টিপলামও শেষ পর্যন্ত। হাতের রাইফেল গর্জে উঠল। খালি একঝলক ধোঁয়া!

নীচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

তাড়াতাড়ি টর্চের আলো ফেললাম। কেল্লা ফতে। গুলিটা বিঁধেছে সরাসরি ওটার গায়ে। কারণ ডালের একাংশ পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে।

শুধু তাই নয়। ডালটা আর নড়াচড়াও করছে না। স্থির হয়েই পড়ে আছে মাটিতে।

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে খোশমেজাজে ধূমপান করতে লাগলেন।

এরকম একটা উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে লম্বুদার নীরবতা যথেষ্টই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াল। আমরা সকলেই মৌখিক অভিব্যক্তিতে তা কিছুটা প্রকাশ করে লম্বুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লম্বুদা কিন্তু আমাদের এই অস্বস্তিকর অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখালেন না। যেন কিছুই ঘটেনি এরকম একটা ভাব দেখিয়ে পরম নিশ্চিন্তেই বসে রইলেন।

আবার ধৈর্য প্রতিযোগিতা শুরু হল। আমরা স্থির চিত্তেই তাঁর মুখ খোলার আপেক্ষায় মুহূর্ত গুনতে লাগলাম।

লম্বুদা নীরব, নিঃশব্দ।

চুরুটটা ক্রমাগতই পুড়ে চলেছে। এভাবে পুড়লে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো চুরুটের আগুন তাঁর মুখ স্পর্শ করবে।

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম চুরুটের সুখ টানটা দিয়েই হয়তো তিনি আবার মুখর হবেন। কিন্তু আমাদের সে অনুমানও শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল প্রমাণিত হল। তিনি চুরুটের কেস খুলে আর একটি নতুন চুরুট বার করলেন এবং নেড়ে চেড়ে তার গঠন পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মুখে কেউ কিছু প্রকাশ না করলেও, এবার সবাই উসখুশ করতে শুরু করল। কারণ সত্যি সত্যিই দ্বিতীয় চুরুটটা যদি তিনি সেবন করতে শুরু করেন, সেটা শেষ হতে হতে হয়তো বা—

কিন্তু লম্বুদা যে খুব একটা উদাসীন নন, সেটা প্রমাণ করলেন হঠাৎ মুখর হয়ে।

দেশলাইয়ের ওপর চুরুটটিকে টানটান করে শুইয়ে রেখে বললেন, গাছের ডালটার নড়াচড়া স্থির হতে, আমি পুনরায় আমার আসল

উদ্দেশে মনোনিবেশ করলাম।

রাত ইতিমধ্যে আরও গভীর হয়েছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম জীবজন্তুর কণ্ঠস্বরও কানে আসছে।

কোন কোন চীৎকারকে বাঘের ডাক বলে মনে হলেও, বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। তবে মনে মনে কামনা করছি যেন তা বাঘেরই হয়।

দুটো বাজল। তিনটে বাজল। সাড়ে তিনটে নাগাদ হঠাৎ 'গ-র-র-র' একটা শব্দ কানে এল।

অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা না গেলেও, চোখে বায়নাকুলার লাগালাম। শব্দটা যেখান থেকে আসছিল সেই স্থান বরাবর তাকাতেই মনে হল ঝোপটা নড়ছে। তবে কারুরই অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না।

ধৈর্য ধরেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। পাঁচ মিনিটও কাটেনি ঝোপের ডালপালা সরিয়ে বেরিয়ে এল দীর্ঘ এক রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বেশ খোশমেজাজেই এগুতে লাগল যেদিকে হরিণের খণ্ডিত দেহটা পড়েছিল।

হরিণটাকে যে এই বাঘটাই খেয়ে গিয়েছিল তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। আজ হয়তো বা নতুন শিকার কিছু মেলেনি। তাই বাকি অংশটা উদরসাৎ করতে এসেছে।

একবার মনে হল বাঘটাকে গুলি করি কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল এই বাঘটাই যে সেই বাঘ এমন কোনও প্রমাণ নেই। সেটা সুনিশ্চিত না হয়ে অযথা একটা বাঘ শিকার করার কোন মানেই হয় না। তাতে সুনামের চেয়ে দুর্নামের সম্ভাবনাই বেশী। অতএব অপেক্ষা করতেই হবে।

প্রায় একঘণ্টা কাটার পর বাঘটা বেরিয়ে এল জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে। অন্ধকারে তার আসল রূপ দেখা না গেলেও, চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতোই জ্বলছিল।

আমার গাছ থেকে তার দূরত্ব বেশী হলে পঞ্চাশ গজের মতো। বাঘটা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল তারপর ধীরে ধীরে এগুতে লাগল নদীর দিকে। নদীর পথ ধরতে আমি আশ্বস্ত হলাম। এখন আর কোনও সংশয় রইল না আমার মনে। বায়নাকুলারটাও বাগিয়ে ধরলাম দু'হাতে।

বাঘটা নদী বরাবর এগিয়ে গিয়ে ঘাড় নীচু করে জল খেল কিছুক্ষণ। তারপর যে পথ দিয়ে সে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে গেল!

যে কোনও বাঘই তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খেতে আসতে পারে। অগত্যা আমায় রাইফেল নাবাতে হল। বাঘটাও পরম নিশ্চিন্তে হারিয়ে গেল বনের অন্ধকারে।

আবার প্রতীক্ষা শুরু হল। তবে বেশীক্ষণ নয়। হঠাৎ গাছের তলা দিয়ে ক'টা শিয়াল ডাকতে ডাকতে ছুটে পালিয়ে যেতে আমি তৎপর হয়ে উঠলাম।

বাঘকেই ওরা বেশী ভয় করে। অতএব তাদের এই আচরণ যে বাঘের আবির্ভাবের ইঙ্গিত তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই!

বায়নাকুলার চোখে লাগালাম। অন্ধকারে বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না। তবে ছায়ার মতো কিছু জীবজন্তুকে এদিক সেদিক দৌড়া-দৌড়ি করতে দেখা যাচ্ছে।

সকৌতূহলে আমি যখন এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই বাঘটা বেরিয়ে এল পাশের ঝোপ থেকে এবং বন কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল।

বাঘটা যে বেশ বড় সড় এবং তেজী সেটা তার ডাকেই ধরা পড়ল। সে সোজাই এগিয়ে আসতে লাগল আমার গাছ বরাবর।

গাছের কাছাকাছি এসে সে ওপর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বারকয়েক দেখে তার চারপাশে পাক খেতে লাগল।

এতো সামনাসামনি বাঘ কোন দিনও পাইনি। স্বভাবতঃই হাত নিস্ পিস করে উঠল। কিন্তু উপায় নেই।

এবার বাঘটা গাছের পাশে এসে একমূহূর্ত দাঁড়াল এবং সশব্দে ঘ্রাণ নিতে লাগল।

আমি যে মগডালে আস্তানা গেড়ে ছিলাম সেখান থেকে আমার দেহের ঘ্রাণ পাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

বাঘটা ঘ্রাণ টানতে তাই আমি একটু ভাবনায় পড়লাম। আমার

গন্ধ পেয়ে সে যদি কাছাকাছি কোথাও আস্তানা গাড়ে, তখন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গুলি ছুঁড়তে হবে।

বাঘটা মিনিট পনেরো কুড়ি সেখানে ঘোরাফেরা করল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল নদীর দিকে।

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মুহূর্ত গুনছি। এতো কাছাকাছি বাঘের দেখা পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার।

ওদিকে লনচের ভেতর তখন অন্ধকার। ওরা বাঘ শিকার করতে এসে বেশ নাক ডাকিয়েই ঘুমোচ্ছে।

বাঘটা গিয়ে নদীর তীরে দাঁড়াল এবং গলা উঁচু করে কি যেন দেখতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত জলে নাবল বাঘটা। সাঁতরিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগত বিপরীত দিকে।

আমি যে কি খুশী হলাম তা আর বলবার নয়। অর্থাৎ এই বাঘটাই যে নদী পেরিয়ে রাতারাতি অপকর্মটি করে আসে সেটাই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। বাঘটা যদি তেমন দ্রুত গতিতে এগুতে আরম্ভ করে হয়তো বা রাইফেল-রেঞ্জের বাইরেই চলে যাবে। লনচে করে তার পিছু ধাওয়া করলেও যেরকম জমাট অন্ধকার, আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া তার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়।

কার্তুজ ভরাই ছিল। শুধু নিশানা করার জন্য যে সময়টুকু দরকার।

এক—দুই—তিন! অব্যর্থ লক্ষ্য। রাত কাঁপানো একটা চীৎকারে কেঁপে উঠল জলজঙ্গল। তারপর জল কেটে দ্রুত সাঁতরাবার ছপছপানি শব্দ।

আহত বাঘটা হয়তো ডাঙ্গাতেই ফিরে আসছে। রাইফেলে গুলি পুরে আবার আমায় প্রস্তুত হয়ে থাকতে হল।

বাঘটা সত্যি সত্যিই জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠল এবং টলতে টলতে জঙ্গলের দিকে এগুতে লাগল।

আবার রাইফেল গর্জে উঠল। আবার চীৎকার—তবে আগেকার মতো নয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বল!

দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাঘটা পড়ে গেল মাটিতে। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করতে গিয়েও থেমে গেলাম। আমার কাঁধটা অসম্ভব রকম ভারী হয়ে উঠেছে!

নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেছে ভেবে প্রথমে তেমন গুরুত্ব দিলাম না। বাঘের মতিগতির প্রতি লক্ষ্য রাখলাম।

কিন্তু সে অসুবিধা উত্তরোত্তর বাড়তেই লাগল।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌঁছল মনে হল যেন একটা বিরাশী কিলো ওজনের পাথর ঘাড়ের ওপর কে চাপিয়ে দিয়েছে।

তখন বাঘের দিকে লক্ষ্য রাখতেই অসুবিধা হতে লাগল। ঘাড় সোজা করে বেশীক্ষণ থাকা যাচ্ছিল না।

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবার জন্য বাঘটাকে আর একবার গুলি করব ঠিক করেছিলাম কিন্তু এ অবস্থায় তা করতেও মন গেল না। বরং বাঘটা যদি পাল্টা আক্রমণ করে সেই ভয়েই ভীত হয়ে পড়লাম।

বাঘের মধ্যে অবশ্য কোনও সাড়া ছিল না। তার নিঃস্পন্দ দেহটা লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে।

এতক্ষণ কাঁধটাই কেবল ভারী ঠেকছিল। এবার শিরদাঁড়া বরাবর একটা মৃদু ব্যথা শুরু হল এবং মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করতে লাগল।

গাছের মগডালে বসে এরকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সঙ্গে যুঝতে যথেষ্টই অসুবিধায় পড়তে হল। কোনরকমে যদি একবার মগডাল থেকে মাটিতে পড়ি হাড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু কিই-বা করার আছে। কাছেই বাঘের দেহটা যেভাবে পড়ে আছে নীচে নাবাটাও এখন যথেষ্ট বিপজ্জনক। বলা যায় না তো এটাও যদি বাঘের ছলনা হয়!

অগত্যা হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না। দেখতে দেখতে পাখী ডেকে উঠল চারদিকে। সূর্যের আলোও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল।

শহরে বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু

এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যভূমিতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য কখনও হয়নি। তাই মুগ্ধ হয়েই সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

সূর্যের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনেক বন্য জীবজন্তুর ডাক মিলিয়ে গেল, তেমনি অনেকে আবার ডেকেও উঠল।

বেলগাছের নিম্নাংশের একটা ডাল বেয়ে একটা বিষাক্ত কেউটে সাপ সড় সড় করে নীচে নেবে গেল।

সাপটা যে জাতেরই হোক না কেন, তার সঙ্গে সহাবস্থান করেছি একথা ভাবতেও গা শিরশির করে ওঠে। অন্য সময় হলে হয়তো বা বীরোচিত কিছু একটা করেই ফেলতাম। কিন্তু তখন যা মনের অবস্থা ভগবানের নাম স্মরণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

এদিকে রাইফেলের গুলির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল তিন-জনেরই। বাইরে আবছা অন্ধকার থাকার দরুন তারা আর কেউ সাড়া-শব্দ করল না। মট্‌কা মেরেই লনচের ভেতর বসে রইল।

দিনের আলো ফুটতে তবে তাদের সাড়া পেলাম। লনচের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে তারা বেলগাছের দিকে সকৌতূহলে তাকাতে লাগল।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি ইশারায় তাদের নিস্পন্দ বাঘটা দেখিয়ে দিলাম।

বাঘটা দেখামাত্রই ওদের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। ইশারায় প্রশ্ন করল বাঘটা মরেছে তো নাকি—

আমি বললাম, কাছে গিয়েই দেখ না।

আমন্ত্রণ জানাতে তবেই ওদের সন্দেহ ঘুচল। কারণ মিথ্যা বলে আমি যে তাদের জীবনের ঝুঁকি নেব না একথা তারা ভাল করেই জানত।

আমার কথা মতো তারা বেরিয়ে এল লনচ্ থেকে। অবশ্য খালি হাতে কেউই ছিল না। তিনজনের হাতেই লাঠি ও বল্লম ছিল। বাঘের কাছ বরাবর ওরা খুব সন্তর্পণেই এগিয়ে এল। অধীর মণ্ডল ছিল সামনে। পেছনে ছিল যথাক্রমে পরান আর অটল।

নিষ্প্রাণ বাঘের পিঠে ওরা পর পর ক'বার বল্লমের খোঁচা দিল। কিন্তু

বাঘের কোনরকম সাড়া শব্দ মিলল না।

খুশীতে উথলে উঠল ওদের চোখ। ওরা তিনজনে সাহস ভরে এগিয়ে গেল বাঘের কাছে। বাঘের ইহলীলা সাঙ্গ হল কিনা যাচাই করতে।

বাঘ সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হতে এবার তিনজনেই এগিয়ে এল আমার গাছের কাছে এবং আমাকে নীচে নামবার জন্য আহ্বান জানাল।

আমি দেখলাম আর গোপন করে লাভ হবে না। এখন সরাসরিই ওদের সাহায্য চাওয়া ভাল। ওরা গ্রামের মানুষ সহজেই আমার এই অসুবিধার কারণ উপলব্ধি করতে পারবে। সংক্ষেপে আমার অসুবিধার কথা ওদের বলে, গাছ থেকে নাবার ব্যাপারে ওদের সাহায্য চাইতেই ওদের তিনজনের মুখ ভয়ে পাংশুটে হয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে পেছু হটতে লাগল।

আমি চীৎকার করে বললাম, কী ব্যাপার তোমরা পালাচ্ছ কেন? আমার কি হয়েছে?

অধীর বললে, সাহেব আপনাকে অত করে নিষেধ করলাম ভূত চতুর্দশীর রাতে বেল গাছে উঠতে। আপনি তো কথাই শুনলেন না। বেলগাছে উঠলেন, বেলডাল কাটলেন। আবার বেলডাল লক্ষ করে গুলিও ছুঁড়লেন।

এখন যদি আপনার ঘাড়ে সেই বেলে-ভূত চেপেই থাকে, খুব কি অন্যায় করেছে?

এতক্ষণ আমি শারীরিক অসুস্থতা ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলাম। ওদের মুখ থেকে এ কথা শোনামাত্রই মনে হল, তাই তো এরকম একটা কিছু ঘটা তো অসম্ভব নয়। যা হোক অনুমানের ভিত্তিতেই অযথা মন খারাপ না করে শেষ পর্যন্ত নিজেই গাছ বেয়ে নীচে নাবতে শুরু করলাম।

ওরা ইতস্ততঃ করতে লাগল। অর্থাৎ আমাকে সঙ্গ দেওয়া আদৌ উচিত হবে কিনা এটাই ওদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

নদী পার হতে হবে বলেই হয়তো বা ওরা পালাল না। আমার সঙ্গে বেশ বড়রকমের একটা ব্যবধান রেখেই ওরা লনচের দিকে এগুতে লাগল।

লনচে আমি উঠতে ওরা তিনজনেই পাইলটের আসনে আশ্রয় নিল এবং বেশ দূরত্ব বজায় রেখেই কথাবার্তা বলতে লাগল।

ওদের হাবভাব আমার ভাল লাগল না। আমি খুব কম কথাই বলতে লাগলাম।

তবে, যেহেতু নদী পারের প্রশ্ন ছিল ওদের কিছুটা সমীহ করে না-চলা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

এদিকে দ্রুত গতিতেই লনচ চলতে শুরু করল।

ওপারে পৌঁছতে ওরা আমায় লনচ থেকে নাবতে নিষেধ করল এবং রোগ নিরাময়ে ডাক্তারের খোঁজে বেরুল।

ডাক্তার বলতে ওদের গ্রামে সেকালের এল. এম. এফ রাধিকা রঞ্জন বাবুই ভরসা। তাকে ডেকে নিয়ে এসে ওরা লনচে তুলল।

তিনি আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সবই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন।

তারপর খস্ খস্ করে এক চিলতে কাগজে এ্যানাসিন ট্যাবলেটের নাম লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

এ রোগ যে এ্যানাসিনে সারবার নয়, সেটা আমার মনই বলল। আমি প্রেসক্রিপসানটা নদীর জলে ভাসিয়ে দিলাম।

অধীর, পরান ও অটল নিজেরা ভূতের ভয়ে লনচের ধারে না ঘেঁষলেও আমার ঘাড়ে ভূত চাপার খবরটা রটাতে ইতস্ততঃ করল না।

একরকম বাড়ী বাড়ী গিয়েই, সবার কানে ফিস ফিস করে খবরটা পৌঁছে দিয়ে এল।

এটা টের পেলাম বেলা বাড়ার সাথে সাথেই দলে দলে গ্রাম্য বউ-ঝিদের, ছানাপোনা ট্যাকে নিয়ে এই লনচের দিকে এগিয়ে আসতে

দেখে। তারা এসে একরকম ঘিরেই ফেলল লনচ্‌টা।

তবে কেউই আমার কাছাকাছি এল না। ভুলবশতঃ কেউ এলে তাকে ডেকে নিচ্ছিল মাতব্বরেরা।

এদিকে আমার শরীরের ভাবগতিক ভালো নয়। ঘাড়ের চাপ ক্রমশঃই বাড়ছে এবং বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অধীর বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল। ওকে ডেকে এক কাপ চা খাওয়ানোর কথা বলতেই, আচ্ছা দেখছি বলে সেই যে হাওয়া হয়ে গেল ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তার আর পাত্তা নেই।

আমি দেখলাম এরকম অসহায় অবস্থায়, লনচে্‌ বসে থাকার কোনই অর্থ হয় না। ভূতের ভয়ে যেরকম সবাই পালিয়ে বেড়াচ্ছে, না খেতে পেয়ে শেষকালে আমিই মরে ভূত হয়ে যাব। কিন্তু আমি তো সে বান্দা নই—

নেবে পড়লাম লনচ্‌ থেকে।

আমাকে নাবতে দেখে, কৌতূহলী জনতা কয়েকমিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

পরান চক্ষুলজ্জার খাতিরে পালাতে পারল না। বেশ ব্যবধান রেখেই আমাকে বলল, স্যার আপনার শরীর ভালো নয়। এই চড়া রোদ্দুরে বেরুলেন কেন?

আমি হাসলাম। আমি কি আর বেরিয়েছি, ভূতই আমাকে টেনে নাবালো লনচ্‌ থেকে।

আমি মিঃ চক্রবর্তীর বাড়ী চললাম। খবরটা তো তাকে পৌঁছে দেওয়া একান্ত দরকার।

সে তেমন কিছু আপত্তি করল না। বরং ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডাইরেক্টর মিঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিয়ে যথেষ্টই সাহায্য করল।

মিঃ চক্রবর্তীর বাড়ীর দূরত্ব বেশী নয়। ওখান থেকে মাইল চারেকের পথ। সাইকেল রিক্সায় বড়জোর মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগে।

আমার টুকিটাকি জিনিষপত্তর ওরাই তুলে দিল গাড়ীতে। আমি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গাড়ীতে চেপে বসলাম। শরীরটা তখনও বেশ খারাপ।

মিঃ চক্রবর্তী বাড়ীতেই ছিলেন। আকস্মিক আমার উপস্থিতিতে একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন, কি মশাই, খালি হাতে ঢুকলেন যে বড়। বাঘ কই? মেরে খেয়ে ফেললেন নাকি?

আমি হাসলাম। প্রায় সেইরকমই। তবে আপনার মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই। মাংসটা আমি খেলেও মুড়োটা আপনার জন্যে এনেছি। আপনি তো মুড়ো খেতে ভালোবাসেন। বলুন ঠিক কি না?

মিঃ চক্রবর্তী খুবই পাকা লোক। আমার ইঙ্গিত বুঝেই তিনি করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন। মৃদু হেসে বললেন, জানতাম এ কাজ একমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব!

মিঃ চক্রবর্তী নামেই বাঙ্গালী। আচরণে পাকা সাহেব। বেলা বারোটা বাজতে না বাজতে লাঞ্চে বসতে হল। খেতে খেতে বাঘ মারার গল্পই শুরু করলাম।

তিনি বেশ উৎসাহভরেই আমার অভিজ্ঞতা শুনছিলেন। কিন্তু ভূত প্রসঙ্গ উঠতেই মুখটা তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, বলেন কি মশাই ভূত আপনার ঘাড়ে চেপে বসে আছে আর আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! আমার ঘাড়ে চাপলে তো মশাই এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতাম!

মিঃ চক্রবর্তী কথা বন্ধ করে গোগ্রাসে ঝোল মাখা ভাত গিলতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম তিনিও ভয় পেয়েছেন। তা না হলে চামচ ফেলে হাত দিয়ে হঠাৎ খেতে শুরু করবেন কেন?

খাওয়া শেষ করেই তিনি ফোন করলেন, সুন্দরবন হেলথ সেণ্টারের

ডাক্তার কমল বিশ্বাসকে। বললেন, এখনি একবার আসুন। একটা সিরিয়াস কেস।

ফোন রেখে এক গ্লাস জল খেলেন। আমাকে বললেন, আপনি আর ঘোরাফেরা না করে ছাদের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। দেখি ডাক্তার বিশ্বাসের সঙ্গে পরামর্শ করে কি করা যায়।

তিনি যে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। অযথা আর কথা না বাড়িয়ে আমি ছাদে উঠে বেড়াতে শুরু করলাম। এ ছাড়া আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না।

ইতিমধ্যেই ডাক্তার বিশ্বাস এসে হাজির হলেন। ঘাড়ে ভূত চাপার লক্ষণাবলী সম্পর্কে তিনি দীর্ঘক্ষণ অনুসন্ধান চালিয়ে বললেন, মেডিকেল সায়েন্সে তো ভূতে ধরা বলে কোনও রোগের নাম নেই।

এটাকে আমরা পাগলামিই বলি এবং সেই মতোই চিকিৎসা করে থাকি।

মিঃ দত্তের অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, এটাকে আমরা পাগলামির পর্যায়ই ফেলব এবং তারই চিকিৎসা করব।

আমি প্রেসক্রিপসান লিখে দিয়ে যাচ্ছি। তিনঘণ্টা অন্তর একটা করে পুরিয়া আর এক দাগ করে মিকশ্চার খাইয়ে দিন ভূত তো দূরের কথা, তার ঠাকুর্দাও যদি এসে থাকে, ওষুধের গুঁতোয় ঘাড় ছেড়ে, পিট্টান দেবে।

ডাঃ বিশ্বাস চলে যাবার পরেই মিঃ চক্রবর্তী ছুটলেন ওষুধ সংগ্রহ করতে। ডাঃ বিশ্বাসের চিকিৎসার ওপর তার যথেষ্ট আস্থা ছিল।

যথাসময়েই তিনি ফিরে এলেন ওষুধ নিয়ে এবং পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। পুরিয়াটা মুখে দিতে তেমন কিছুই টের পেলাম না বটে, কিন্তু মিকশ্চার মুখে দিতেই গা পাক দিয়ে উঠল। রাম তেতো!

বমি হয় হয়, চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটোতে তবে সে ভাব গেল।

ওই মিকশ্চার মুখে দিতে আর ইচ্ছা করল না। বললাম, লোকে এতো জিনিষ মাথায় বহে বেড়ায়, আর আমি একটা ভূত বইতে পারব না? থাকুক ও আমার ঘাড়ে! খাওয়ানো দাওয়ানোর ঝঞ্ঝাট নেই যখন

তখন আর চিন্তা কি। বড়জোর মাঝে মাঝে একটু আধটু বদমাইসি করবে এইতো—করুক, আমরাও কি কম বদমাইস নাকি?

মিঃ চক্রবর্তী অবশ্য আমার মতে সায় দিলেন না।

ওষুধ বাতিল করতে তিনি গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, মিঃ ছুট মেডিকেল সায়েন্সে যখন আপনার বিশ্বাস নেই ওঝাকেই খবর দিই, কি বলুন? ওঝা ছাড়া আপনার ঘাড়ে চড়া ভূতকে কেউ নাবাতে পারবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। আমি অবশ্য আপত্তি করিনি।

লম্বুদা একমিনিট নীরবতা পালন করলেন। আমরা সকলেই উদগ্রীব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, শেষ পর্যন্ত ওঝাও এলো।

ছ' ফুট দীর্ঘ, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে রক্তবসন, পায়ে খড়ম, কপালে লাল চন্দনের টিপ আর হাতে একগাছা ছড়ি।

আমি ছাদের ঘরে কৌচে গা এলিয়ে তন্ময় হয়ে হেডলী চেজের লেখা একটা ক্রাইম নভেল পড়ছিলাম।

সে কিন্তু আমাকে জানান না দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ল এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ প্রশ্ন করল, স্যার ঘাড়ের কোন দিকে ভূতটা চেপেছে বলে মনে হচ্ছে···

উত্তর আমায় দেবার দরকার হল না। মিঃ চক্রবর্তীই আমার হয়ে সব উত্তর দিতে লাগলেন।

ওঝা সব কথাতেই মাথা ঝাঁকাতে লাগল। এ পর্ব শেষ হতে সে আমার দিকে কট কট করে তাকিয়ে রইল।

প্রায় পাঁচ মিনিট এইভাবে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ খ্যাঁক্ করে মুখে একটা শব্দ করে বললে, হুম যা ভেবেছি তাই। এ সাধারণ ভূত নয়। খুব বজ্জাত প্রকৃতির বলেই মনে হচ্ছে। আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল এইমাত্র। চিনতে পারামাত্রই জোড়া পায়ে লাথি দেখাল আমাকে।

দাঁড়াও! লাথি দেখানো বার করে দিচ্ছি! জানিস আমার

পরিচয়! আমরা সাত পুরুষের ওঝা। কম করে অন্ততঃ বিশ হাজার ভূত মানুষের ঘাড় থেকে ভূঁয়ে নাবিয়েছি। আর তুইতো কোন ছার।

যা হোক চারঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এই বেলা নেবে যা সুড় সুড় করে ঘাড় থেকে। তা না হলে ফল কি হবে আশা করি বুঝতেই পারছিস।

ভূতকে চারঘণ্টা সময় দিয়ে ওঝা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিঃ চক্রবর্তীকে ডেকে ঘাড় থেকে ভূত নাবাতে কি কি জিনিস লাগবে তার একটা ফর্দ লিখতে বসল।

যথাসময়েই ফর্দ মতো তিন মন কাঠ, ত্রিশ কিলো খাঁটি গাওয়া ঘি, দশ কিলো শুকনো ঝাল লঙ্কা আর পাঁচ কিলো মধু এসে হাজির হল। এই দিয়েই নাকি ভূত নিধন যজ্ঞ বসবে।

চারঘণ্টা দেখতে দেখতেই কেটে গেল। ওঝা ঘরে ঢুকে আমায় প্রশ্ন করল, কিছু অনুভব করছেন? ভূত ঘাড় থেকে নাবল!

আমি ঘাড় নাড়তেই ওঝা আবার আমার মুখের দিকে কটকট করে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে বললে, হুম্ যা ভেবেছি তাই। ব্যাটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে! এটা পালঙ্ক নাকি র‍্যা? এ্যাঁ…

ভূত অবশ্য কোনওরকম সাড়াশব্দ ছাড়াই মটকা মেরে পড়ে রইল।

ওঝা অগত্যা যজ্ঞ করতে বসল। গনগনিয়ে উঠল কাঠের আগুন। ঘি আর মধু মিশিয়ে ঢালা হল তার মধ্যে। সে হাতের ছড়িটা ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এটা চলার পরে লঙ্কা ছড়ানো শুরু হল আগুনের ওপর। লঙ্কা পোড়া গন্ধ বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। কোয়ার্টারে যে যেখানে ছিল সকলেই অবিরাম হাঁচতে শুরু করে দিল।

আমিও হাঁচি চাপতে পারলাম না। নাক টিপে থাকলেও রীতিমত কাঁপিয়ে কাঁপিয়েই হাঁচি আসতে লাগল।

এই এলাহি কাণ্ড করেও কাজ কিছুই হল না। দেখেশুনে ওঝাও

বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, এতেও তোর শিক্ষা হল না। এবার ঝাঁটা পেটা খাবার জন্য তৈরী হ' তাহলে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি আপত্তি করলাম। ঝাঁটা পেটা খেতে আমি অন্ততঃ রাজী নই।

কারণ ঝাঁটা কেবল ভূতের দেহেই পড়বে না, আমার দেহেও পড়বে। ভূত ছাড়বে কি না ছাড়বে, শুধু শুধু আমিই বা ঝাঁটা পেটা খেয়ে মরি কেন।

আমি আপত্তি করাতে ওঝা বেশ চটেই গেলো। বললে, ভূত তো ছানার সন্দেশ নয় যে মুখে দিলেই গলে যাবে। তাকে হজম করতে গেলে কষ্ট একটু তো করতেই হবে সাহেব।

সব এড়িয়ে যেতে চাইলে চলবে কি করে? বেশ ঝাঁঝিয়ে কথাগুলো বলে উঠল ওঝা আমাকে।

আমার চৌদ্দ পুরুষের কেউ কখনো আমাকে ধমকে কথা বলতে সাহস করেনি। আর এ তো কে না কে!

ধ্যুত্তোর! ভূতের নিকুচি করেছে বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের উদ্যানে গিয়ে বসলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমার ঘাড়ের ভূত আমিই নাবাব। কারুর আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

হতাশ ওঝা বোধ হয় এই সুযোগই খুঁজছিল। আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে রাগের ভান করে সরে পড়ল সেখান থেকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসার পর আমি ঘুরে ঘুরে উদ্যানের গাছগুলো চেনবার চেষ্টা করছি হঠাৎ একটা গাছের পাতায় চোখ পড়তেই চেনা চেনা ঠেকল। বিছুটি গাছের পাতা দেখতে ছবহু এইরকমই।

আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টারমশাই দুষ্ট ছেলেদের শাস্তি দেবার জন্য এই রকমের একটি গাছ পুঁতেছিলেন স্কুল বাড়ীর লাগোয়া জমিতে।

আমার অনুমানটা যাচাই করার জন্য উদ্যানের মালির শরণাপন্ন হলাম। মালি গাছটা দেখেই বললে, হাত দেননি তো। খুব সাবধান বুনো বিছুটি!

যেখানে লাগবে চুলকে চুলকে মাংস তুলে না ফেলা পর্যন্ত রেহাই পাবেন না। এই দেখুন না আমারই পায়ে একবার বিছুটি লেগে কি হাল হয়েছিল!

মালি কাপড় সরিয়ে হাঁটুর ওপর একটা নতুন ছালের অস্তিত্ব দেখাল। সব দেখেশুনে নিজের মনেই হা-হা-হা করে হেসে উঠলাম আমি। ভূতকে পুত না বানানো পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। লম্বুদা হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন।

এটা তাঁর চিরকালের স্বভাব। তাঁর এই আকস্মিক নীরবতায় আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাটা কিছুই অসম্ভব নয়।

বললাম, লম্বুদা অনুগ্রহ করে শেষ করুন। গাছে তুলে আর মই কাড়বেন না।

লম্বুদা হাসলেন। এক মিনিট চোখ বুজে বসে থাকার পর ওই হাসির রেশ টেনেই বললেন, বেশ ক'টা বড় বিছুটি পাতা সংগ্রহ করলাম ওই গাছ থেকে। যে ঘরটা আমার থাকার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন মিঃ চক্রবর্তী সেই ঘরে একটা প্রকাণ্ড আয়না ছিল। এই আয়নার সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আগে ভূতটা আমার শরীরের কোন কোন অংশ অধিকার করে হাত পা ছড়িয়ে বসেছে জেনে নিলাম তারপরই ওই বুনো বিছুটি পাতা ঘষতে শুরু করলাম তার দেহের ওপর।

এই দুই তিন—পাঁচ আর গুনতে হল না। তার আগেই কাজ শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ ঘাড়ে যে প্রচণ্ড চাপটা অনুভব করছিলাম আস্তে আস্তে সে চাপটা লাঘব হতে শুরু করল। বেশ মনে হল সাপ জাতীয় কিছু একটা আমার শরীর বেয়ে নীচের দিকে নাববার চেষ্টা করছে।

মনে মনে খুশীই হলাম। কারণ ভূত ঘাড়ে নিয়ে বাড়ী ফিরলে লোকেরা বলবে কি?

সে নাবতে নাবতে একেবারে গোড়ালির গাঁট পর্যন্ত নেবে এসে সেই যে আটকে গেল আর নড়ার নাম নেই।

যে কারণে আমার পা ভারী হয়ে উঠল এবং মাটি থেকে তুলতে বেশ অস্বস্তি হতে লাগল। ওষুধ ধরেছে দেখে মনে মনে খুশী হয়ে উঠলাম। আবার ওই বিছুটি পাতা ঘষতে লাগলাম পায়েতে।

কাজ হল। এবার সে নড়াচড়া করতে শুরু করল বটে, কিন্তু পা ছেড়ে রেহাই দিতে চাইল না আমাকে। অগত্যা অন্য ফন্দী আঁটতে হল।

জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে পা বাড়িয়ে দিলাম এবং গায়ের জোরে লাথি ছুঁড়লাম। সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের লাগোয়া নর্দমাটার পচা জলে 'ঝপাং' করে একটা শব্দ হল। হঠাৎ ওই শব্দ শুনে মিঃ চক্রবর্তীর বাড়ীর লোকেরা ছুটে এলো আমার ঘরে!

ভূতের ভয়ে আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি এমন একটা আশঙ্কাই বোধহয় তাদের মনে উঁকি মেরেছিল।

ওদের সদলবলে ঢুকতে দেখে আমি হা-হা-হা করে হাসতে লাগলাম। ওরা কি ভাবল কে জানে। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

'ভূতের হাত থেকে আমি মুক্ত' একথা তাদের বোঝাতে আমায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল, বলে, লম্বুদা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

ভূত তাড়ানোর এই অভূতপূর্ব কাহিনী শুনে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু কেউই কোন মন্তব্য করছিলাম না।

লম্বুদা আমাদের এই মৌনতা উপভোগ করতে লাগলেন। দুপক্ষই যখন নীরব ইন্দ্রজিৎই হঠাৎ রসভঙ্গ করল।

লম্বুদার উদ্দেশে বললে, আচ্ছা লম্বুদা আপনি ভূতের গায়ে বিছুটি ঘষে ঘাড় থেকে নাবিয়েছেন বললেন। কিন্তু ভূত তো অদৃশ্য, অশরীরী। তার গায়ে বিছুটি পাতা ঘষলেন কি করে জানতে পারি কি?

লম্বুদা এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন

না। এক মিনিট ইন্দ্রজিতের মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হো-হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। বুদ্ধি খাটালে কিনা হয় ?

তিনি পুনরায় ধূমপানে মন দিলেন।

ইন্দ্রজিৎ নাছোড়বান্দা। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেই বললে, লম্বুদা জানি সাগরের মতোই বুদ্ধি ঠাসা আপনার মগজে কিন্তু কি ভাবে সেটা প্রয়োগ করলেন সেটাওতো আমাদের জানা দরকার, নয় কি ?

রাইট, বলে লম্বুদা গোঁফের ফাঁকে একঝলক হাসলেন। সেই হাসির রেশ টেনেই বললেন, বলছ ! এতোই যখন তোমাদের আগ্রহ, শোন তাহলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি, ভূত রয়েছে ঘাড়ে অথচ তার অস্তিত্ব টের পাব না এ কখনো হয় ? ভূতের অস্তিত্ব খুঁজে বার করার জন্য কাঁধের ওপরেই একটা চিমটি কাটলাম। কোনও সাড় নেই অর্থাৎ আমি কিছু টেরই পেলাম না। ধরে নিলাম সেখানে ভূতের কোন না কোনও অঙ্গ আছে। তা না হলে আমি টের পাব না কেন।

আবার তারই পাশে এক জায়গায় চিমটি কাটতে স্পষ্টই সেটা টের পেলাম। বুঝলাম সেখানে তার কোনও অঙ্গ নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি কাঁধের সর্বত্র চিমটি কেটে ভূত আমার দেহের কোন কোন অংশ দখল করেছে চিহ্নিত করে ফেললাম। এবার তার ওপরেই ওই বুনো বিছুটি পাতা ঘষতে লাগলাম নির্মমভাবে।

সঙ্গে সঙ্গেই ওষুধ ধরল। বিছুটির প্রচণ্ড চুলকানিতে অস্থির হয়ে ভূত বাপ্ বাপ্ বলে আমার দেহ ছেড়ে পা ধরল। কিন্তু আমি তাকে পায়েও আশ্রয় দিলাম না—লম্বুদার চোখ দুটো চক চক করে উঠল।

আমরা একরকম প্রস্তুত ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে 'গুরু' গুরু' বলে চীৎকার করে উঠলাম।

লম্বুদা মাথা নত করে আমাদের এই শিরোপা গ্রহণ করলেন।

———